সাহিত্য-রত্নাবলী।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ প্রণীত।

শ্রীস্থরেন্দ্রমোহন দত্ত বি, এ, বি, টি,
সম্পাদিত।

দত্ত এণ্ড ফ্রেণ্ডস্।
৬৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ইং ১৯১৭।

মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

PUBLISHED BY
S. K. MITTRA,
For Messrs. DUTT & FRIENDS.

ভূমিকা।

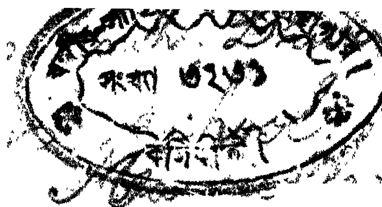
ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখনিঃসৃত বাণী শুনিবার যাঁহাদের সুবিধা ঘটে না, তাহাদিগের উদ্দেশে তাঁহার কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সারগর্ভ উপদেশমালা সঙ্কলিত হইল। যুবকদিগের উপযোগী করিবার নিমিত্ত মূল প্রবন্ধগুলি তাঁহার অনুমত্যনুসারে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সকল নীতি ও ধর্ম্মের সার কথা এরূপ জ্বালাময়ী ভাষাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আশাকরি যে এই পুস্তক যুবকমাত্রেরই হৃদয় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে সহায়তা করিবে। ইহাতে ধর্ম্মবিশেষের গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই। সর্ব্বদেশের মহাপুরুষদিগের গুণাবলী সমভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে দুই মহাপুরুষ বর্ত্তমান ভারতের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, জাতীয় সম্পদ্‌রূপে প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্র যাঁহাদের জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী, অগ্রেই তাঁহাদের জীবনের স্থূল ঘটনাবলীর সহিত পাঠকের পরিচয় হইল।

বহুকাল শিক্ষাদানের ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নৈতিক চরিত্র গঠন করিবার পক্ষে মহাজনগণের জীবনের আখ্যায়িকাবর্ণন একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যখনই বালকগণের সম্মুখে কোন মহৎ জীবনের পুণ্য কাহিনী বিবৃত করিয়াছি, নিতান্ত অমনোযোগী বালকও উৎকর্ণ হইয়া

অতি আগ্রহের সহিত উহা শ্রবণ করিয়াছে : এমন কি, কখন কখন কেহ অধিক কথা জানিবার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করিয়াছে। বাস্তবিক উপদেশাপেক্ষা দৃষ্টান্তই মানব-মনকে সহজে উদ্‌বুদ্ধ করে।

বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয় সমূহে যে সকল পুস্তক পঠিত হয়, উহাতে নানা বিষয়ক তথ্য থাকিলেও, মহৎ জীবনের আখ্যায়িকার নিতান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ সেই অভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে মোচন করিতে সমর্থ হইবে এই ভরসায় ইহা প্রকাশিত হইল।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯১৬। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত।



সাহিত্য-রত্নাবলী

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি যে জল বৃষ্টি ঝটিকা সহিয়া যুগ যুগ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা কি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া? কখনই নহে। তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্টিত, এবং যে সকল আভ্যন্তরীণ ধাতুপুঞ্জের সংঘাত দ্বারা তাহার দেহ গঠিত, সে সকল ধাতুপুঞ্জও ঘন-নিবিষ্ট এই জন্য; তদ্ভিন্ন গিরি কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। ও গিরি যে দাঁড়াইয়া আছে তাহা নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া; নিরন্তর বর্ষার জলধারা তাহার অঙ্গ-সন্ধিকে শিথিল করিতেছে; তাহার দৈহিক ধাতু সকলকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে; বহুল শিলাখণ্ড অশনি-নিনাদে শৃঙ্গ হইতে পাদদেশে পাতিত করিতেছে; চক্ষের নিমেষে তরু লতা শ্রীসৌন্দর্য্য সকলই হরণ করিয়া লইতেছে; আবার কখনও বা ভীষণ ভূকম্পে ঐ গিরি-দেহ বিদারিত হইয়া জ্বালামুখী প্রকাশ পাইতেছে; শত শত বনপ্রদেশ ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নেত্রের অগোচর হইয়া যাইতেছে; কোথাও বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, অবিশ্রান্ত জ্বলিয়া, সুদূর-প্রসারী অরণ্যানী সকলকে ভষ্মীভূত করিতেছে। গিরির জীবন কি সংগ্রামের জীবন! কিন্তু এই সংগ্রামের

মধ্যে ও গিরি দণ্ডায়মান আছে; শীতাতপ সহিয়া বিধাতার কাজ করিতেছে; গিরির ভিত্তি দৃঢ়, গিরির দেহের বন্ধন দৃঢ় বলিয়া। এ জগতে একজন মহামনা ব্যক্তিকে আমার এই গিরির সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ গিরি এমন আছে যাহার শীতাতপের সহিত সংগ্রাম নাই? তেমনি কোন্ মহৎ চরিত্র এমন আছে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত যাহার সংঘর্ষণ নাই? আবার কোন্ গিরি এমন আছে যে নিজের আভ্যান্তরীণ দৃঢ়তার গুণে দণ্ডায়মান নয়? তেমনি কোন্ মহৎ চরিত্রই বা এমন আছে যাহা আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের গুণেই মহৎ নয়?

এ জগতে যিনি উঠেন তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া, সাধারণের উপরে মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান; তিনি আভ্যন্তরীণ মাল মশলার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কুষ্মাণ্ড যেমন যষ্টির সাহায্যে মাচার উপরে উঠে. তেমনি কোন্ কাপুরুষ, কোন্ অলস শ্রমকাতর মানুষ, কোন্ হীনতেজা নতজানু মানুষ, কোন্ অবিশ্বাসী ক্ষীণ-শক্তি মানুষ, কেবল মাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া, পড়িয়া, বহিয়া; সহিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, কাঁদিয়া, কাটিয়া মানুষ হইতে হয়; "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"; মনুষ্যত্ব বা মহত্ব লাভের অন্য রাস্তা নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ত্ব প্রদান করেন না।

আমি এরূপ একটি মহৎ চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি রামমোহন রায়। নচিকেতা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছেন;—"শতানামেমি প্রথমঃ", আমি শতজনের মধ্যে প্রথম হইতে চাই; রামমোহন রায় যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে সময়ে এদেশবাসীদিগের ভিতরে লক্ষের মধ্যে—লক্ষের কেন কোটির মধ্যে—তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? সে কালের লোকের কথাই বলি বা

কেন? তাঁহার জন্মের পর এই ত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃত মহত্বগুণে তাঁহার ত্রিসীমা মধ্যে আসিতে পারিয়াছে?

বলিতে কি, শঙ্করের পর এরূপ মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ আর কয়জন এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার প্রদীপ্ত দিবালোকের নিকটে আমরা কি খদ্যোত নহি? আমরা কি সেই প্রদীপ্ত ধূমকেতুর পুচ্ছ-লগ্ন জ্যোতিঃকণিকা-মাত্র নহি?

কিন্তু রামমোহন রায় যে লক্ষের মধ্যে এক হইয়া দাঁড়াইলেন তাহা কিরূপে? যেরূপ ক্ষুদ্র গিরিরাজির মধ্যে অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি যে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে উন্নত-শিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা কোন্ গুণে? তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত গিরিদেহের ন্যায় আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের সাহায্যে। এইরূপ কতকগুলি চরিত্রগত উপাদানের উল্লেখ করিব।

প্রথম উপাদান তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান। মানবের আত্মাকে তিনি অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত; তাঁহা হইতে উৎপন্ন; তাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং তাঁকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি; ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এই জন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন যে, তদ্দ্বারা মানবাত্মাকে শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন, ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত করে। এই কারণে পৃথিবীর যে কোনও বিভাগে লোকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিত, তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত; এবং স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াসে কোনও জাতি অকৃতকার্য্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। ইটালীয়নগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অষ্ট্রীয়াবাসিগণের

নিকট পরাস্ত হইল ; তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন ; নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপর দিকে স্পেনে যখন নিয়ম-তন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতা টাউন হলে ভোজ দিলেন। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ডিগ্‌বী সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিবার সময় ডিগ্‌বী অনেকবার দেখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন ; যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতা পক্ষের পরাজয় হইতেছে, তাহা হইলে দরদর ধারে তাঁহার দু কপোলে অশ্রুধারা বহিত। কুমারী কলেট্‌ বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড গমন কালে গুড হোপ্‌ অন্তরীপে গিয়া জাহাজে পড়িয়া গিয়া রামমোহন রায়ের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, তখন সেই ভগ্নপদ লইয়া সেই জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার জাহাজের কাপ্তেন অনেক নিষেধ করিলেন ; সে নিষেধ তিনি কোনও মতেই শুনিলেন না ; ভগ্নপদে অতিকষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। আসিবার সময় ফ্রান্সের জয়ধ্বনি করিতে করিতে আসিলেন।

তাঁহার ইংলণ্ড-বাস-কালে, ১৮৩১ সালে পার্লেমেণ্ট মহাসভাতে সুপ্রসিদ্ধ Reform Billএর বিচার উপস্থিত হয়। ঐ আইনের দ্বারা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের স্বাধীনতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার প্রস্তাব হয়। রামমোহন রায় সেই প্রস্তাবে আপনাকে এতদূর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছিলেন যে, ঐ আইন বিধিবদ্ধ না হইলে তিনি ইংলণ্ডের অধিকারে আর থাকিবেন না ; তাঁহার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার ক্রীড়া-ভূমি

আমেরিকাতে গিয়া বাস করিবেন। কি স্বাধীনতা-প্রিয়তা! কি মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান!

এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান আর একদিকে অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমনি একটা প্রভাব ছিল, এমনি একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনও ছোট কাজের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাঁহার সমীপে ছোট কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না। তাঁহার বন্ধু উইলিয়াম এডাম একদিনের একটী ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ঘটনাটি এই—একদিন রামমোহন রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরাহ্নে হঠাৎ এডামের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এডাম দেখিলেন তাঁহার মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। রামমোহন রায় বলিলেন,—"তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি।" পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া বলিলেন,—"জল! জল"! ত্বরায় জল দেওয়া হইল। জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন,—"আমার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান আঘাতও সর্ব্বপ্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিডল্‌টন আজ আমাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড় হইবে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোট লোক মনে করে!" এডাম বলিয়াছেন,—"ইহার পরে রামমোহন রায় আর বিশপ মিডল্‌টনের মুখদর্শন করেন নাই।" বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, ইহা তাঁহার চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, অসহনীয় অপমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

কেবল ইহাও নহে মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্মা-

শক্তিতে এত দূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না; কোনও বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্য্যসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন; এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। ইংরাজি বুল্ ডগ্ নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে একবার যে প্রাণীকে কামড়াইয়া ধরে, নিজের দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুল্ ডগের কামড়ের ন্যায় ছিল; তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত ততই তাঁহার বীর-হৃদয় আনন্দিত হইত। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন সম্মুখে বেড়া দেখিলে আনন্দিত হয় যে, উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, তেমনি তাঁহার নির্ভীক হৃদয় বিঘ্ন বাধা দেখিয়া আনন্দিত হইত যে, উল্লম্ফন ও উলঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু আছে। বিঘ্ন দেখিয়া হঠিয়া যাওয়া, ভয় প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা বশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজ শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের মিশনারিগণ যখন তাঁহার প্রণীত "Third Appeal to the Christian Public" তাঁহাদের ছাপাখানায় মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন তিনি নিজে মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া, মানুষদিগকে কম্পজিটারের কাজ শিখাইয়া, নিজের গ্রন্থ তাহাতে মুদ্রিত করিয়া তবে ছাড়িলেন। স্কচ মিশনারী এলেক্জাণ্ডার ডফ যখন তাঁহার আহ্বানে কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রথম মিশনারী স্কুল স্থাপনের পথে সুমহৎ বিঘ্ন দেখিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, যখন সহরের ভদ্রলোকেরা এমনি বিরোধী হইলেন যে, স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ী ভাড়া করা

ও পড়িবার জন্ত বালক সংগ্রহ করা ডফের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, তখন রামমোহন রায়কে এই বিঘ্ন বাধার কথা জানাইলে তিনি ডফের স্কুল বসাইবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি ত কিছুতেই পিছু-পা হইবার লোক ছিলেন না। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রহ্মসভার পূর্ব্বাশ্রিত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী ডফের স্কুলের জন্ত স্থির করিয়া দিলেন; এবং আপনার বন্ধুবান্ধবের পরিবার হইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। ইহা করিয়াও নিরস্ত হইলেন না; স্কুল খুলিবার দিন নিজে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করিলেন; এবং তৎপরে সর্ব্বদা গিয়া স্কুলের কার্য্য পরিদর্শন দ্বারা ও পরামর্শদানাদি দ্বারা ডফকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বিলাত গমনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার ও পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় অভীষ্ট সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিজের সহিত যাইবার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করিলেন। যে সময়ে সমুদ্রে পা বাড়াইলেই জাতিচ্যুত হইবার ভয় ছিল, সে সময় বিলাত গমনের জন্য পাচক ব্রাহ্মণও হিন্দু ভৃত্য সংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন কাজ ছিল, সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। যিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতা কর্ত্তৃক গৃহতাড়িত হইয়াও স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহার কিছুই বিচিত্র ছিল না।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না স্বাবলম্বন শক্তি তার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে, কি ছোট হইয়া থাকিবে তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন বাধা পাপ প্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়; তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর

করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি বড়; আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এই জন্য আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়া ছিলেন তাহারও ভিতরকার কথা নিজের শক্তি সামর্থ্যেও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে কি বিরুদ্ধগুণ সকলের সমাবেশই ছিল। এই উৎকট মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান ও তজ্জনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তির পার্শ্বেই প্রগাঢ় সাধুভক্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি মানবাত্মার মহত্ত্ব ঘোষণার জন্য ধর্ম্মবিষয়েও মানবের বিচারশক্তিকে পূর্ণ অধিকার দিলেন; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া অতীত হইতে একবারে পা তুলিয়া লইতে পারিলেন না। যুক্তিকে শাস্ত্রানুসারিণী করিবার জন্য, অথবা শাস্ত্রকে যুক্তির অনুগামী করিবার জন্য, কতই না শক্তি ও শ্রম ব্যয় করিলেন! তিনি যে কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গাঘাতে সমুদয় দেশ কম্পিত হইতেছিল। সে সময়ে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল, যাহারা শাস্ত্রবিধি, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া মানবের চিন্তাকে স্বাধীন ভাবে ও অসঙ্কোচে জীবনের সর্ব্ববিভাগে প্রসারিত হইতে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। ইহারা ধর্ম্মে সংশয় ও নাস্তিকতাবাদ অবলম্বন করিয়াছিল। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে ও ফ্রান্স দেশে এই শ্রেণীর অনেক মানুষ দেখিয়াছিলেন। তাহাদের নমুনা এ দেশেও কিছু কিছু দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগকে দেখিয়া অবজ্ঞাতে মুখ ফিরাইয়াছিলেন। প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছিলেন, "আমি যদি কখনও পরিবার পরিজনকে ইউরোপে আনি, এই শ্রেণীর লোকের সহিত কখনই আমার পুত্র কন্যাদিগকে পরিচিত হইতে দিব না।" তিনি স্বাধীন চিন্তাকে অনেক দূরে ছুটিতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাহা বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায় নহে; পরন্তু "সদশ্বা ইব সারথেঃ" সারথির সদশ্বের ন্যায়,

ভক্তির লাগাম মুখে দিয়া, শাস্ত্র ও সাধুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিয়া। এই সাধু-ভক্তি বা Reverence তাঁহার চরিত্রের দ্বিতীয় উপাদান ছিল।

তৃতীয় উপাদান সকল মহাজনের কার্য্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারও কার্য্যের মূলে ছিল। তাহা এই "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ইহা অনুভব করা যে, এই ভৌতিক জগত যেমন দুর্ভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তেমনি মানবের জীবন ও মানবসমাজ দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত। এক মহাশক্তি বা মহতী ইচ্ছা হইতে মানব-জীবন ও মানবসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহতী ইচ্ছার দ্বারা বিধৃত হইতেছে, সেই ইচ্ছা ও সেই শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে নীত হইতেছে। "স সেতু বিধৃতি রেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" তিনিই সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। মানব-জীবন তাঁহারই শাসনাধীন সুতরাং এখানে ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; ফলাফল সেই ধর্ম্মাবহ পরম পুরুষের হস্তে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ ভাব হইতেই সকল ধর্ম্ম-বীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতে উঠিয়াছিল। সে বীরত্বের কথা যখন স্মরণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারই বাণী ধরিয়া সংস্কারক দলে নাম লিখাইয়াছেন, তাঁহাদের মুখ কত সময় বিষাদে ম্লান দেখিতেছি; তাঁহাদের মুখে নিরাশার ভাষা কতবার শুনিতেছি। কেহ বলিতেছেন,—"কই একেশ্বরের অর্চ্চনা ত দেশে স্থাপিত হইল না। কেহ বলিতেছেন "আমরা কয়জন মরিয়া গেলে আর ইহার নাম গন্ধও থাকিবে না" ইত্যাদি; যেন তাঁহারাই ধর্ম্ম বিধানের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। যখন এই সব

ভাবি, অমনি রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ হয়, দুই ছবিতে কি প্রভেদ! ইঁহারা সহস্র সহস্র সমভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও সাহসকে রাখিতে পারিতেছেন না, আর রামমোহন রায় একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ শত্রু হইল, সঙ্গিগণ ছাড়িয়া গেল; অনুগত ব্যক্তিগণ বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া বৈরীদলে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইল; এরূপ অবস্থাতেও যে দুই চারি জন ইউরোপীয় প্রচারক তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, ধর্ম্ম-সভার সভ্যগণ তাঁহার প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তাঁহাকে সশস্ত্র হইয়া বেড়াইতে হইল; অধিক কি, তাঁহার নিজের জননী কুচক্রী লোকের পরামর্শে তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন; বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমার পর মোকদ্দমা তুলিয়া কষ্ট দিলেন; বিপক্ষগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা তুলিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইলেন। বল, আমাদের কাহার জীবনে এরূপ নির্য্যাতন ঘটিয়াছে? কে এরূপ একাকী ও অশরণ হইয়াছি? অথচ ইহাতে তাঁহাকে একদিনের জন্য ভীত অথবা স্বীয় কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই। তিনি এই সকলের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া বলিলেন,—"এমন দিন আসিতেছে, যখন আমার নির্য্যাতনকারিগণের বংশধরগণ আমাকে দেশের হিতৈষী বন্ধু বলিয়া ধন্যবাদ করিবে—ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে।" এরূপ অবস্থাতে এরূপ বলিতে পারাই মহত্ত্ব। সকল প্রতিকূলতার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারাই মহত্ত্ব। অসংখ্য গোলা-গুলির মধ্যে অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইয়া সত্যের নিশান প্রোথিত করিতে পারাই বীরত্ব। এই বীরত্বের পশ্চাতে ধর্ম্মরাজ্যের বিধাতা

ধর্ম্মাবহ পরম পুরুষের ধর্ম্মশাসনে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল তদ্ভিন্ন এরূপ বীরত্ব জীবনে আসে না।

ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের একটি উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তি সকলকে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা। আমার মানসিক বৃত্তি, দেহের বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধা সমুদয় মঙ্গলময় পুরুষের গচ্ছিত ধন, তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্যয় হইবার জন্য, তাঁহারই প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য,—এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোনও মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই; কোনও মানুষ এ জগতে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই, সকল মহামনা মানুষের জীবনে এক অপূর্ব্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে; বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে; তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা না করিয়া পার নাই। সেন্ট পল্ একস্থলে বলিয়াছেন, "The love of Christ constraineth me,—অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে।" কেবল পলই যে এই প্রকার বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রত্যেক মহামনা মানুষ এইরূপ বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন। এই যে জীবনের ভিতরে দায়িত্ব-জ্ঞান, এই যে অস্ফুট কিন্তু নিরন্তরোদ্বেলিত বাধ্যতা-জ্ঞান, ইহা ভিন্ন কে কবে বড় হইয়াছে? কে কবে বজ্রমুষ্টিতে কার্য্য করিয়াছে? কে কবে বীরের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, লোকে দেখুক আর না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি, আমার প্রতি যে কার্য্যভার পড়িয়াছে তাহা আমি সাধন করিয়া যাই। তুমি আমি যদি বিশ্বাসে বা প্রেমে এতটা ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমিও বীরের ন্যায় কাজ করিয়া

যাইতে পারিতাম। এই দায়িত্ব-জ্ঞান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ফুটিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন তাহা পূর্ণাঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না। যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। বালকের ন্যায় লঘুভাবে কাজে হাত দেওয়া, অৰ্দ্ধেক মন দিয়া সে কার্য্য করা, স্বল্প প্রতিবন্ধক দেখিয়াই নিরস্ত হওয়া, ইহা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি ১৮১৭ সালে সহমরণের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন, সভাসমিতিতে সেই বিচার চলিল, গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল; সহমরণ স্থলে বলপ্রয়োগাদি করে কি না দেখিবার জন্য বন্ধু বান্ধবকে শ্মশানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন; লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে বিধিমতে সাহায্য ও উৎসাহ দান দ্বারা সবল করিতে লাগিলেন; বহুজনের স্বাক্ষর করাইয়া সহমরণনিবারণার্থ আবেদন পত্র রাজগোচরে প্রেরণ করিলেন; অবশেষে ১৮২৯ সালে রাজবিধি দ্বারা সহমরণ নিবারিত হইলে লর্ড-উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে ধন্যবাদ করিয়া এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিলেন; এবং সহমরণের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশে উক্ত আইনের বিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন; পরিশেষে পাছে তাঁহাদের প্রার্থনা ইংলণ্ডে গ্রাহ্য হয় সে পথে বাধা দিবার জন্য ঐ আইনপক্ষীয়দিগের এক ধন্যবাদ-পত্র পকেটে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। কিছু করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না।

দ্বিতীয়তঃ এদেশীয়দিগের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন এই বিশ্বাস যখন জন্মিল, তখন ১৮১৬ সালে বন্ধুবর ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপনের আয়োজন করিলেন। ১৮১৭ সালে স্কুল স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে তাহার পরিচালন কার্য্য তাঁহার হস্তের বাহিরে গেল; তিনি বাহিরে থাকিয়াও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন

জানিলেন ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির ফল আশানুরূপ হইতেছে না, তখন ১৮২২ সালে তিনি নিজের ব্যয়ে নিজের মনের মত ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন এবং প্রধানতঃ নিজের ব্যয়ে চালাইতে লাগিলেন। ১৮২৩ সালে গবর্ণরজেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের গবর্ণমেণ্ট একটি শিক্ষা কমিটি করিয়া তাঁহাদের হস্তে কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনপূর্ব্বক প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের ভার দিলেন। তখন রামমোহন রায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। গবর্ণমেণ্টের প্রাচ্য নীতির ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে এক পত্র লিখিলেন। এই রূপে তাঁহার সাধ্যে যতটুকু ছিল করিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না।

ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন তাহার ত কথাই নাই। ১৬ বৎসর বয়সের সময় যে পতাকা উড্ডীন করিলেন মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তাহা উড্ডীন রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহাকেই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার জন্যই উপনিষদের অনুবাদ, ইহার জন্যই আত্মীয় সভা স্থাপন, ইহার জন্যই বাইবেলের অনুবাদ, ইহার জন্যই খ্রীষ্টীয় পাদরীদিগের সহিত বাগ্‌-যুদ্ধ, ইহার জন্য খ্রীষ্টীয়দিগের প্রতি নিবেদন, ইহার জন্যই ইউনিটেরিয়ান কমিটী সংগঠন, ইহার জন্যই এডাম সাহেবের উপাসনালয় স্থাপন, অবশেষে ইহার জন্যই ১৮২৮ সালে ব্রহ্মসভা স্থাপন, তাহার গৃহ নির্ম্মাণ, সেই গৃহ ট্রষ্টীহস্তে অর্পণ, ও ১৮৩০ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাতে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা। কোনও কাজে হাত দিয়া তিনি আধখানা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই।

তৎপরে যেমন তাঁহার ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল তেমনি মানবের প্রতি উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যের চালক ও পোষক ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যত উদার তত্ত্ব মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে তন্মধ্যে মানব জাতির একত্ব একটি অদ্ভুত তত্ত্ব। যতই বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত ও সাহিত্যাদি আলোচিত হইতেছে, যতই যাতায়াতের সুবিধা হইয়া বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রণ বৃদ্ধি পাইতেছে, যতই বাণিজ্য সূত্রে জগতের জাতিসকল পরস্পরের সহিত স্বার্থ ও আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, ততই এই তত্ত্বটি মানবচিত্তে জাগিয়া উঠিতেছে। জগতের জাতি সকল জানিতে পারিতেছেন সমস্ত জগতের মানবকুল এক সূত্রে গ্রথিত। রামমোহন রায় আর এক দিক দিয়া এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রন্থ অনুশীলন করিয়া জানিয়াছিলেন যে, জগতের জাতি সকলের বিভিন্নতার মধ্যে প্রকৃতিগত একতা প্রচ্ছন্ন আছে, এবং বিধাতা সকল জাতির মধ্যে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন; তাঁহার অভিব্যক্তি কোনও এক বিশেষ জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে। এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব হইতে তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি স্বদেশ ও সমগ্র জগতের নরনারীর দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্কর নরসেবা ব্রতে আপানাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটী মূলমন্ত্র উঠিয়াছিল, সেটী এই—"The service of man is the service of God.—অর্থাৎ মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।" এইটি তাঁহার মুখে শুনা যাইত। তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার মানব-প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব-প্রীতির ন্যায় সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব্বদেশের ও সকল জাতির নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইতেন, সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে কোনও জাতির যে কোনও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে, এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতরকার কথা এই ছিল যে,

তাঁহার প্রেম সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। এই কারণেই তিনি এরূপ ধর্ম্মের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন যাহা সমগ্র জগতের সমুদয় মানব-সমাজকে একসূত্রে বাঁধিবে। এই সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের চিন্তা নিরন্তর তাঁহার হৃদয়ে বাস করিত। তিনি যখনই কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ক্রিয়া দেখিতেন তখনই এই আধ্যাত্মিক মহাধর্ম্মের ভাব তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইত। দুর্গোৎসবের সময় যখন বিবিধ সাজে প্রতিমা সাজাইয়া লোকে বিসর্জ্জন করিতে যাইত, তখন তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ যদি বলিতেন,—"দেওয়ানজী! দেখুন দেখুন কেমন প্রতিমা সাজাইয়াছে!" অমনি তিনি বলিতেন "Brother, Brother, ours is Universal Religion অর্থাৎ ভাই! ভাই! আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।" বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনা গিয়াছে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত।

ইংলণ্ড বাসকালে যখন খ্রীষ্টিয়দিগের ভজনালয়ে যাইতেন, এবং তাঁহারা যখন ভজনা করিতেন, তিনি একান্তে বসিয়া কাঁদিতেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—"দেশের লোকের কথা মনে করিয়া কাঁদিতেছি, কতদিনে তাহারা ভ্রম কুসংস্কার দূর করিয়া উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

আমার বোধ হয় এই স্বাভাবিক মানব-প্রেমের জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রতি এত বিরাগ ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অদ্বৈতবাদী হন নাই। তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে গৃহীর ধর্ম্ম করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাতে ধর্ম্মসাধকের অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র ছিল না। সর্ব্বদা দেখিতে পাই প্রচলিত ধর্ম্মের কোন কোন সাধক বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রচারকগণ, আপনাদিগকে ধার্ম্মিক দেখাইবার জন্য কতই ব্যগ্র হন। গৈরিক ধারণ

করিয়া, মালা কমণ্ডলু লইয়া, গৃহ পরিবার ত্যাগ করিয়া কস্তরূপে মানুষকে বলেন,—"তোমরা যেরূপ আমরা সেরূপ নই; তোমরা সংসারী আমরা বিরাগী; তোমরা ভোগী আমরা যোগী; তোমরা আসক্ত আমরা ত্যাগী" ইত্যাদি। রামমোহন রায়ের মতি গতি যেন ঠিক্ ইহার বিপরীত ছিল। তিনি উপদেশ লিখিয়া অপরকে দিয়া পড়াইতেন; গ্রন্থ লিখিয়া কোনও শিষ্যকে পড়াইয়া তাহার নামে ছাপিতেন; একদিনও আচার্য্যের আসনে বসেন নাই; আহার ব্যবহার, আলাপে সামান্য মানবের ন্যায় থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। ইংলণ্ড বাসকালে পদস্থ বন্ধুদিগের অনুরোধে রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় দেখিতে যাইতেন; সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী Fanny Kemble এর অভিনয়ে তুষ্ট হইয়া তাহাকে কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ ও আপনার প্রণীত ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল উপহার দিয়াছিলেন; এক ইংরাজ দম্পতী তাঁহার নামে আপনার শিশু পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন; রাজা শত প্রকার বড় বড় কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে সেই শিশু বন্ধুকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার খেলার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেন; এবং তাহার জননীকে আনন্দিত করিতেন; কলিকাতা বাস কালে বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া গাছে দোলা টাঙ্গাইয়া তাঁহাদের সহিত দোল খাইতেন। এ সকল কেমন স্বাভাবিক! কেমন সুন্দর! কেমন মানবীয় ভাবসম্পন্ন! ইহার মধ্যে ধর্ম্ম সাধকের বিকৃত মুখভঙ্গী, বিরস ও তিক্ত বদন, নির্দ্দোষ আমোদের প্রতি ভ্রূকুটি, এ সকল কিছুই নাই। অপর দিকে মানব প্রেম হইতেই তাঁহার চিত্তে নারী জাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা উঠিয়াছিল। সেই ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর নারীগণের সমক্ষে বালকের ন্যায় নম্র ও প্রেমে আর্দ্র হইতেন। যেখানেই যাইতেন স্ত্রীগণ তাঁহার পক্ষপাতিনী হইতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিব্বতের নারীগণ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। শেষ দশায় মৃত্যুশয্যায় কুমারী হেয়ার

একজন ইংরাজ রমণী, কন্যার ন্যায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। প্রাণবায়ু যখন তাঁহার শ্রান্ত কলেবরকে পরিত্যাগ করিল, তখন ডাক্তার এসলিন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন কুমারী হেয়ার পড়িয়া অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন। মানুষকে যিনি এত ভালবাসিতেন, মানুষ কেন তাঁহাকে ভালবাসিবে না? প্রেমে প্রেম চেনে; নারীহৃদয় স্বভাবতঃ প্রেমিক, সুতরাং নারীগণ প্রেমিক মানুষকে চিনিতে পারেন।

জীবনের মহালক্ষ্য সাধনের জন্য রামমোহন রায়ের ব্যগ্রতার কথা বলিয়াছি, সে বিষয়ে তাহার চিত্তের একাগ্রতার বিষয় এখনও বলিতে বাকী আছে। তাহা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সে কি একাগ্রতা, যে সময়ে তিনি জন্মিয়াছিলেন সে সময়ে সর্ব্ববিভাগে ভাঙ্গিয়াগড়িবার চেষ্টা চলিতেছিল। ইংরাজ রাজগণ তখন প্রায় সকল বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সর্ব্ববিভাগে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে এদেশীয় চতুর সহকারীদের উপর নির্ভর করিতে হইত। এই কারণে সেই সময়ে চতুর মানুষের পক্ষে প্রভূত ধন উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত ছিল! এই কারণে তৎকালে দেশীয় সমাজে দেখিতে দেখিতে ক্রোড়পতি লক্ষপতি হওয়া একটা দৈনিক ঘটনার মধ্যে হইয়া উঠিয়াছিল; এবং ধনাগমের বাসনা প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শত শত হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। বিষয় সম্পত্তি, বিষয় সম্পত্তি, এই লোকের ধ্যানে জ্ঞানে প্রবেশ করিয়াছিল। অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় ভোগ-লালসা সর্ব্বত্র অনির্ব্বাণ অনলের ন্যায় বাড়িতেছিল। ইহার মধ্যে রাম-মোহন রায় দেখা দিলেন। তিনি ১৮০৩ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিষয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যেও দেখা যায় যে, বিষয় কার্য্যে থাকিয়াও অবসর কাল তাহার জীবনের প্রধান কার্য্য যে ধর্ম্মসংস্কার তাহারই চিন্তাও আয়োজনে যাপন করিতেন।

রঙ্গপুরে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সহিত বিচার উপস্থিত করিয়া দেশব্যাপী আন্দোলন তুলিয়া দিলেন। ১৮১৪ সালে যেই ডিগ্‌বী সাহেব ছুটি লইয়া গেলেন, অমনি তিনিও চাকুরি ছাড়িলেন। কলিকাতাতে আসিয়া বসিয়া কি নিজের শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ সুখে ভোগ করিতে পারিতেন না? তাহা করিলেন না। করিলেন কি, না বেদান্তের অনুবাদ, পৌত্তলিকতা নিরাকরণ, সত্য ধর্ম্মের প্রচার, সহমরণ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যে মুক্ত হস্তে সেই ধন রাশি রাশি ব্যয় করিতে লাগিলেন। কোন কোন গ্রন্থ তিনি তিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ১৮৩০ সালের মধ্যে তিনি এমনি নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন যে, দিল্লীর সম্রাটের উকীল হইয়া ইউরোপে যাইতে হইল। ইংলণ্ডে গিয়াও তাঁহার গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রিত করিতে ও এদেশীয় প্রজাদিগের সত্ব ও অধিকার রক্ষার জন্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন। কুমারী কলেট বলিয়াছেন দারিদ্র্যের তাড়না তাহার অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ হইয়াছিল। স্বকার্য্য সাধনে কি চিত্তের একাগ্রতা! কেবল তাহা নহে, শুনিলে কৌতুক বোধ হয়, তিনি রঙ্গভূমিতে, নৃত্যাগারে, সুহৃদ-গোষ্ঠীতে যেখানে গিয়াছেন, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে যে, কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্যমনস্ক হইয়া তিনি এক কোণে, কোনও বন্ধুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ ও বিচার উপস্থিত করিয়া তাহাতেই মগ্ন আছেন। স্বীয় লক্ষ্য সাধনে কি আবেশ! কি নেশা! সর্ব্বত্র একই চিন্তা, সর্ব্বত্র একই প্রধান প্রসঙ্গ, সর্ব্বত্র একই প্রধান আলোচনা, তাহা মানবের ধর্ম্মভাবের ও ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি! এই একাগ্রতা তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্বের আর একটি উপাদান ছিল।

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচনটি প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥

অর্থ -তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করে ; কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে জীবিত, যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

মনন শব্দের অর্থ মনের ক্রিয়া বা ব্যাপার। লূতাতন্তুর ন্যায় অথবা ক্ষৌমকীটের ক্ষৌমকোষের ন্যায় মন সর্ব্বদাই কিছু বুনিতেছে; আপনার অন্তর্নিহিত জ্ঞানসামগ্রী সকলের সাহায্যে সর্ব্বদাই নব নব আদর্শ রচনা করিতেছে, মনের এই যে অবিশ্রান্ত গঠনকার্য্য ইহার নাম মনন। ইহা মানবেরই স্বধর্ম্ম, অপর জীবে নাই।

মানুষের দুইটা জীবন আছে, এক দেহ-রাজ্যে, আর এক এই মনন-রাজ্যে। দেহ রাজ্যের জীবন সমাপ্ত, সংকীর্ণ-ক্ষেত্রে আবদ্ধ এবং শক্তি, সময় ও সুবিধাদিদ্বারা নিয়মিত ; কিন্তু মনন-রাজ্যের জীবন অতি মহৎ, সুদূর-প্রসারিত ও গগন-সঞ্চারী বায়ু স্রোতের ন্যায় স্বাধীন। জগতের মহামনা ব্যক্তিগণ দেহরাজ্যের জীবনকে তুচ্ছ জানিয়া মনন-রাজ্যের জীবনকেই সার জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যাঁহারা মানবসমাজের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের মনন-রাজ্যেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে কতকগুলি উপাদান দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে প্রধান—

বর্ত্তমানে অতৃপ্তি। ইহাও মানব-প্রকৃতির স্বধর্ম্ম বলিলে হয়। মানব স্বীয় অবস্থাতে কখনই পরিতৃপ্ত নহে। মানব যাহা একবার পায়, তাহার প্রতি আর ফিরিয়া তাকায় না; যাহা পায় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে পাইতে পারে, সেই পথ চাহিয়া থাকে। বর্ত্তমান দেখিয়া আমরা সর্ব্বদাই অসুখী। আমরা যেন সর্ব্বদা বলিতেছি—আমি আপনার মনের মত হইতে পারিলাম না; আমার গৃহ পরিবার আমার সমাজ, আর এই প্রকাণ্ড মানব সংসার, আমি যে দিকে তাকাই, কেহই, কিছুই, ঠিক মনের মত নহে; মনের মধ্যে যে পূর্ণতার আদর্শ আছে সকলই যেন তাহার নিম্নে পড়ে। মানবের আচার ব্যবহারে, কার্য্য আলাপে, আইন আদালতে, যতটা সত্য, যতটা ন্যায় বা যতটা প্রেম আছে, যেন তাহা যথেষ্ট নহে; আমরা আরও চাই; ইহাই যেন মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। এই যে অতৃপ্তি, যাহা তোমার আমার হৃদয়ে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় থাকে, উস্কাইলেই পাই, প্রশ্ন করিলেই দেখা দেয়, ইহাই জগতের ধর্ম্ম বা সমাজ-সংস্কারকদিগের হৃদয়ে ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পায়; এই অতৃপ্তি নর-প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঘোর দুঃখে নিমগ্ন করে।

তাঁহাদের সহিত আর একটি বিষয়ে আমাদের প্রভেদ আছে। আমাদের অতৃপ্তি অনেক সময়ে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয় উদয়ে হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নির্ম্মলচিত্ত মহামনা ব্যক্তিদিগের অন্তরে তাহা স্থায়ী ফল প্রসব করে। তাঁহারা এই অতৃপ্তি লইয়া বসিয়া থাকেন না; মনন-শক্তির বলে ভবিষ্যতের ছবি গড়িতে থাকেন। ইহা যেন কতকটা ছায়াবাজী বা ম্যাজিক-লণ্ঠনের ন্যায়। মন নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শকে ভবিষ্যতের পটে ফেলিয়া সেই শোভা দর্শন করিতে থাকে ও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমানের হীনতা ভুলিয়া যায়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চক্ষে এই ভবিষ্যতের ছবি মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বোধ হইতে পারে; মৃগতৃষ্ণিকা

যেমন জলের মত দেখায়, অথচ জল নয়, এই ছবিও সেইরূপ সত্যের মত দেখাইলও সত্য নহে। ইহার জন্য সেরূপ ব্যক্তি এক পয়সাও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু জগতের এক শ্রেণীর লোকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক সত্য আর কিছুই নাই। চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে, তাঁহারাও ইহাকে সেইরূপ উজ্জ্বল ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ধ্যান জ্ঞানে প্রবেশ করে; তাঁহাদের চিত্তকে সিক্ত ও আপ্লুত করে; তাঁহাদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে ও হৃদয়কে জাগ্রত করে। তৎপরে জগতের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকদিগের আর একটি লক্ষণ আছে, তাহাও মানব প্রকৃতির স্বধর্ম্ম বলিলে হয়। সেটি নিজ মনন-গঠিত আদর্শে অনুরাগ। অনুরাগের এই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আজি যদি সকলে শুনেন, একজন চিত্রকর নিজে এক নারীমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত এমনি প্রেমে পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য সে আহার-নিদ্রা-বিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা হইলে সকলে তাহাকে বাতুল মনে করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি দেখি, মানব-প্রকৃতিতে এই বাতুলতা বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ আপনার মনন-শক্তির দ্বারা যে ছবি বা যে আদর্শ সমুৎপন্ন করে, তাহাতে এমনি আসক্ত হয় যে, জীবনকে জীবন জ্ঞান করে না। ইহা প্রতিদিন প্রত্যেকে দেখিতেছেন, লক্ষ লক্ষ লোক স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বা গৌরবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীনতা বা জাতীয় গৌরব কি বস্তু? ইহার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকার? ইহা কোন্ স্থানে বাস করে? ইহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক পদার্থ আর কি হইতে পারে? ইহা মানবের মনন-রচিত, কল্পনা-সমুদ্ভূত আদর্শ মাত্র। একজন ইংরাজ যে জাতীয় গৌরবের জন্য প্রাণ দেয়, একজন কাফ্রী সে জাতীয় গৌরব দেখিতে পায় না কেন?

গত শতাব্দীর শেষ ভাগের ফরাসি বিপ্লবের অধিনায়ক সাম্য ও স্বাধীনতার জন্ত যেরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, কোন্ পুরুষ কোন্ স্ত্রীলোকের জন্য আজি পর্য্যন্ত ততদূর ক্ষিপ্ত হইয়াছে? তাই বলি মানুষ আপনার মনন-শক্তির রচিত ছবিকে এত ভালবাসিতে পারে যে, কোনও পুরুষ স্ত্রীকে বা কোনও স্ত্রী পুরুষকে তত ভালবাসে না। বিষয়াশক্তিশূন্য, নিঃস্বার্থ, প্রেমিক প্রকৃতিতে এই প্রেম পূর্ণ মাত্রায় জাগিয়া থাকে। তাঁহারা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যান, এবং মানুষ যেমন আলেয়ার পশ্চাতে ছোটে, তেমনি তাহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন। আবার ভাবিয়া দেখ, এই যে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, এই যে ভবিষ্যৎ রচনা, ও এই যে মনন-রচিত আদর্শে আসক্তি, ইহাদের অন্তরালে কি? কোন্ ছবিতে মানুষকে বাতুল করে? ন্যায় ও অন্যায়, সাম্য ও বৈষম্য, সত্য ও অসত্য, ইহার মধ্যে কোন্‌টিতে মানব চিত্তকে উন্মাদ-গ্রস্ত করে? কোন্-টির জন্য মানুষ প্রাণ মন সমর্পণ করে? সাম্যের পরিবর্ত্তে বৈষম্য যদি ফরাসি-বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের লক্ষ্যস্থলে থাকিত, তাহা হইলে কি তাঁহারা সেরূপ ক্ষিপ্ত হইতে পারিতেন? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানেই মানব-চিত্ত ভবিষ্যতের কোনও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উম্মাদ-গ্রস্ত হইতেছে, সেখানে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাই দেখিতে চাহিতেছে; এবং এই গুলিই হৃদয়ে থাকিয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যদেশ সকলে ভূমিকম্পের ন্যায় যে ঘন ঘন সমাজ-কম্প হইতেছে, এবং ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজাতে যে ঘোর বিদ্রোহ চলিতেছে, সেখানেও মানুষের দৃষ্টি সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ। অতএব যদি বলি যে স্বয়ং ঈশ্বর মানব-আত্মাতে নিহিত থাকিয়া মানব সমাজকে আপনার অভিমুখে

লইতে চাহিতেছেন, তাহা হইলে কি অত্যুক্তি হয়? ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত আছেন বলিয়াই আমাদের এ প্রকার বাতুলতা রহিয়াছে। ইহা হৃদয়বাসী ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ইহা তাঁহারই ফুৎকার। এই বাতুলতাতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমরা জগতের অসত্য অন্যায়, অপ্রেমের বিষয় চিন্তা করিয়া পাগল হইতে পারি, এই টুকুই আমাদের মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব কেন, এটুকু আমাদের দেবত্বও বটে; কারণ এখানে দেব মানবে সম্মিলন। যদি বল সকলেত পাগল হয় না, আমি বলি, মনুষ্য নামধারী সকলে ত মানুষ নয়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা এরূপ পাগল মানুষ দুই চারি জন পাই। তাহা না হইলে মনুষ্য-সমাজের গতি কি হইত? আমি এরূপ একজন পাগল মানুষের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পাগল বলিতেছি? যিনি গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া, জগতের ধনধান্য সম্ভোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের আরাম, বিশ্রাম, আত্মীয়তাদির সুখ পায়ে ঠেলিয়া পরের জন্য আপনাকে দুরন্ত শ্রমে নিক্ষেপ করিলেন, যিনি হাজার হাজার টাকা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন, যিনি অম্লানচিত্তে লোকনিন্দা ও নির্যাতনের মুকুট মাথায় তুলিয়া পরিলেন, যিনি লোক নিন্দার বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বালবিধবাদিগকে কর্দ্দম হইতে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এমন মানুষকে পাগল বৈ আর কি বলিব? বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিলে দেহরাজ্যের সামান্য জীবনে কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না? তিনি নিজের শ্রমের অন্ন কি সুখে আহার করিতে পারিতেন না? নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে পণ্ডিতকুলের মধ্যে যশস্বী হইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে কি বাস করিতে পারিতেন না? বঙ্গদেশে এমন কোন্ পদ কে

অধিকার করিয়াছে, যাহা বিদ্যাসাগর মনে করিলে অধিকার করিতে পারিতেন না ? কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দিলেন না। কি যেন কিসের জন্য তাঁহাকে পাগল করিয়া জগতের মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলেন।

আমরা সচরাচর বলি, তিনি দেশমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য পাগল হইয়াছিলেন ; তিনি পরদুঃখে কাঁদিয়াছিলেন ; ওটাত বাহিরের মানুষের কাজ। তাঁহার ভিতরের মানুষটা কি ছিল, অগ্রে তাহাই একটু আলোচনা করা যাউক। তাহা কি যদ্দ্বারা বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব হইয়াছিল ? যাহা তাঁহাকে পার্থিব ধন মানের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতে দেয় নাই, যাহা তাঁহাকে সোজাপথে নিজে অভীষ্টের দিকে লইয়া গিয়াছিল। এ জগতে সোজাপথে চলা কি বড় সহজ ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি সোজা পথে চলা যায় ? যদি গগনে ধ্রুবতারা না থাকিত, তাহা হইলে নাবিকগণ কি সোজা পথে চলিতে পারিত ? সেইরূপ এই তেজস্বী পুরুষসিংহগণ যে জীবনে সোজাপথে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি ? আমি এ জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে চলিতে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর তাহার মধ্যে একজন প্রধান। আমি যখন আট বৎসরের বালক, তখন প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে আমাকে ভাল বাসিতেন, এবং সেই দিন হইতে আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি, এমন সোজাপথে চলিবার মানুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর পার্শ্বে দুই একটা উৎকট দোষও দেখিয়াছি ; কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজা পথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে থাকে না ; বলি, হায় ! হায় ! এমন মানুষ আবার কতদিনে পাইব ?

তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি ? সে কি জিনিষ যাহা হৃদয়ে

থাকাতে তিনি সোজাপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানব-জীবনের মহত্ত্ব-জ্ঞান। কথাটি শুনিতে ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড়। তুমি আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্ স্থান অধিকার করিব, তাহার অনেকটা ইহার উপরে নির্ভর করে। তুমি যদি স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখ, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাতেই সন্তুষ্ট হইবে, যদি মহৎ করিয়া দেখ, তবে মহত্ত্বের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে। তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চ বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্ত-গুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্ম সকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষ-সিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া ঊর্দ্ধ-শিরা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সমগ্র দেশের লোকের বাহু একত্র বাঁধিলে এমন একটা মানুষকে আঁকড়াইয়া ধরা ভার। তিনি স্বদেশবাসীদিগকে বিধবা-বিবাহ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বটে, বাহিরে দেখিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন শীঘ্রই নীয়ে না পড়িয়া শাস্ত্রয় উপরে উঠিয়া শাস্ত্রকে আদেশ করিয়াছিল,—"আমি এইটা চাই, তোমাকে ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে।" শাস্ত্র তাঁহার হস্তে কাদার তালের ন্যায় যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই দিয়াছিল। এই মনুষ্যত্বের বিক্রম সম্বন্ধে কেবল একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই; উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই, উছলিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখকাতর হৃদয় ছিল; সেই জন্যই অপরের প্রতি অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে কোনও মনুষ্যত্বের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা এইজন্য; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টাও এই জন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানব-জীবনের পক্ষে এত হীনতা মনে করিতেন, যে, তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। অনেকে জানেন, তিনি এক কথায় পাঁচশত টাকার চাকুরি ছাড়িয়াছিলেন। তাহার মূলে কি? এই অদম্য, অনমনীয়, মনুষ্যত্ব। ডিরেক্টর তাঁহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় ঠিক সত্যানুগত নহে। তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, ডিরেক্টর শুনিলেন না। বলিলেন, "You must! You must!" এই শব্দদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বের উপরে জ্বলন্ত অয়োগোলকের ন্যায় পড়িল। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; এ চাকুরি তাঁহার বিষবোধ হইতে লাগিল; কেহই তাঁহাকে তাহাতে রাখিতে পারিল না। তৎপরে স্বয়ং লেপ্টনান্ট-গবর্ণর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া পুনরায় স্বীয় পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। লেপ্টনান্ট-গবর্ণর যখন বলিলেন, "তোমার ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে কিসে?" তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"আপনি কি মনে করেন যে আপনাদের দ্বারস্থ না হইলে আমার দিন চলিবে না? আপনি ভাবেন কি? এই কলিকাতা সহরে আমি ৫৲ টাকাতে দিন চালাইতে পারি।" তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করি-

লেন, তাহার প্রধান কারণ এই দেখান যে চাকুরি না করিয়াও তিনি সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বে যে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, যাহা মানব প্রকৃতির গভীর রহস্য এবং যাহা মানবজাতির মুখপাত্র স্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে, উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন, তাহার সহিত তুলনাতে বর্ত্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত, যে, বর্ত্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে যখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় খাটিবার শক্তি ছিল না, তখন এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশায়ী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল; প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঐ অনল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বালারাশি প্রকাশ করিত। তাঁহার কোমল ও পরদুঃখ-কাতর হৃদয়ে বর্ত্তমান সমাজের অসারতা, কৃত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহাকে যাতনাতে অস্থির করিয়া তুলিত।

এমন কি তিনি ক্ষোভে দুঃখে ঈশ্বরকে গালাগালি দিতেন। এক দিন তিনি কোন এক হতভাগিনী বিধবাকে দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; তখন তাঁহার পরিচিত কয়েক জন বন্ধু বসিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি বলিলেন,—“এই জগতের মালিককে যদি পাই, তাহলে একবার দেখি! এ জগতের মালিক থাক্‌লে কি এত অত্যাচার সহ্য করে?” এই বলিয়া কিরূপে দুষ্ট লোকে ঐ বিধবাটির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন, দরদর ধারে তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ফল

কথা এই যে, তিনি যত সত্বর স্বদেশবাসীদিগকে অগ্রসর দেখিতে চাহিতেন, তাহারা তত সত্বর অগ্রসর হইবার লক্ষণ দেখাইত না বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় বিরাগ বর্ষণ করিতেন।

বর্ত্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎ-রচনার শক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি নিজ অন্তরে ভাবি-ভারতের কি ছবি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণাদির চেষ্টা দ্বারা তিনি জানিতে দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের একটি ছবি তাঁহার হৃদয়ে ছিল, তিনি সেই ছবির দিকে স্বদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ; এবং শীঘ্র যায় না বলিয়া সহিষ্ণুতা হারাইতেছিলেন। সে ছবিটীর সমগ্র আয়তন ও পরিসর নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই ; কিন্তু স্থূলতঃ তাহার মূলভাবটি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ের প্রত্যেক যুগ-প্রবর্ত্তক ব্যক্তির ন্যায়, তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে ; আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্য জ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ। হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতিচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসি দেশ-প্রসিদ্ধ কোমৎ দর্শন বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলে, মিত্র মহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে বলিলেন, "বাবা রে একটা giant। দেখলে কেমন বুদ্ধি বিদ্যার দৌড় ! মানুষটার যেমন heart তেমনি head !" এ কথা অবাধে বলা যায় যে, তিনি প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগই সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিচ্য জগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্য-

জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন ; প্রাচ্য প্রীতি, ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন। এই প্রাচ্য প্রতীচ্যের একত্র সমাবেশের গুণেই তিনি বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভুত সমাবেশ করিয়া নব-সাহিত্যের আবির্ভাব করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় মানব-চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য প্রতিচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সে কার্য্য এখনও চলিতেছে ও পরেও চলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি ; প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে শুনিতেছি—আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহা স্বদেশ-বাসীদিগকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল বা আদর্শ স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। কি অসুবিধাতেই তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল—না ছিল উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক! নিজে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং অনেক স্থলে টোলের পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইয়াছে।

তিনি যে কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই এই প্রতীচ্য জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বর্ত্তমান বীটন অথবা বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও উক্ত কলেজে

গিয়া বালিকাদিগকে বিধিমতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিষয়ে ডিরেক্টারের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়; সেই মতভেদ হইতেই মনান্তর জন্মে। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যজীবনে প্রতীচ্য জ্ঞানের সমাবেশ না হইলে দেশ উঠিবে না। অতএব বলিতেছি, তিনি বর্ত্তমানে অতৃপ্ত হইয়া নিজে মনে মনে একটা ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া তদভিমুখে স্বদেশকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোকের দুই প্রকার ভাব দেখি। এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতিতে শ্রদ্ধার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক; তাঁহারা অতীতের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাসমন্বিত যে, বর্ত্তমানের প্রতি যখনি তাঁহাদের অতৃপ্তি জন্মে, তখনি উঁহারা আবেগের সহিত অতীতের দিকে যাইতে চান। তাঁহাদের চিত্ত অতীতের দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়ায়; অতীতের চিন্তার মধ্যেই তাঁহারা বাস করিতে ভালবাসেন। অপর শ্রেণী সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরিয়া রহিয়াছেন; ভবিষ্যতের মধ্যেই তাঁহারা বাস করেন; আশার চক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখেন ও সেই দিকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে লইতে চান। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শাক্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইদানীং কালে রামমোহন রায়, এই প্রকৃতি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, এই প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরই মানব মনের উপরে সমধিক প্রভাব হইয়া থাকে। কারণ আশার অপেক্ষা ভাল জিনিষ আর নাই। যে মানুষকে আশা দেয়, সেই জীবন দেয়। যিনি বলেন-"তোমরা এখন মলিন বটে, কিন্তু চিরদিন মলিন থাকিবে না; তোমাদের জন্য শুভদিন আসিবে—চল তদভিমুখে অগ্রসর হই";—তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমরা এরূপ সেনাপতির বিজয়-বৈজয়ন্তীর তলে দাঁড়াইতে ভাল

বাসি। এ জীবন যেন রণ-ক্ষেত্রের ন্যায়। এখানে আমরা সহস্র প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে স্বীয় স্বীয় জীবনের আদর্শসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছি; নিরন্তরই আশা নিরাশার আন্দোলনে দুলিতেছি; বিষাদ ও অনুশোচনার যাতনা সহিতেছি; অতি বলবান্ হৃদয়ও এই কঠোর সংগ্রামে সময়ে সময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যখন আমরা নির্জ্জনে জীবনের ভার বহনে ম্লান ও ম্রিয়মান হই, তখন যদি কোনও বলবান্ পুরুষের আশা-জনক বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যদি শুনিতে পাই এক জন বলিতেছেন, 'অগ্রসর হও! অগ্রসর হও! ভয় নাই, জয়শ্রী সম্মুখে' তাহা হইলে আমাদের অবসন্ন মনে তাড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়; আমরা স্বতঃই তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হই। এইরূপ বিক্রমশালী ও আশাপূর্ণ ব্যক্তিরাই মানব সমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরমলাভ; একবার দেখিলে তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে।

এই সকল চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি। ইঁহাদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং ইঁহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। ইঁহারা যখন অন্তর্হিত হন, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে ইঁহাদের চরিত্র সম্পত্তি পাইয়া আমরা ধনী হই। ইঁহাদের চরিত্রের গুণাবলী অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মার অস্থি মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যায়। বিধাতার এই সত্যময় রাজ্যে এক কণা খাঁটি জিনিষ নষ্ট হয় না। কেহ কি এরূপ মনে করেন যে, যদি আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটিও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন না করি বঙ্গ-সমাজ বিদ্যাসাগরহীন হইবে? তাহা কি সম্ভব? বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়া বঙ্গভূমি উঠিয়াছে, আর কে তাহাকে নামাইতে পারে? বহুক না কেন প্রতিকূল স্রোত, কিছুদিন বহিতে দেও, সে মহৎ চরিত্রের কার্য্য আবার

দেখিতে পাইবে। রামমোহন রায়েরও কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই, কিন্তু তাঁহার জীবন কি বিফলে গিয়াছে? অপেক্ষা কর, দেখিবে অচিরকালের মধ্যে রামমোহন রায় ভারতাকাশে উজ্জ্বলতাতে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্ররূপে শোভা পাইবেন।

আবার বলি, যাঁহারা মনুষ্যের দ্বারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাই সার্থক জীবিত, তাঁহাদের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। তাঁহাদিগকে লইয়াই জাতির গৌরব। যেমন দূর হইতে হিমালয়ের ক্ষুদ্র পাদশৈল সকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে, এবং হিমালয়ের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনি অপর জাতি সকল দূর হইতে এই সকল অসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত মহত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকে। ইঁহাদিগকে বুঝিতে পারা এবং সমুচিত শ্রদ্ধা দিতে পারাও মহত্ত্বে উঠিবার সোপান-স্বরূপ।

আমরা বাল্যকালে লোকের মুখে শুনিতাম, চোরেরা তৈলাক্ত হইয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে, যদি ধরা পড়ে যেন পিছলিয়া পলাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই এক শ্রেণীর পবিত্রচেতা মানুষ যেন তৈলাক্ত হইয়া এ সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহারা এখানকার পথে গতায়াত করেন, অথচ, এখানকার কর্দম পঙ্ক তাঁহাদিগের আত্মাতে লাগে না, এবং এখানকার পাপ প্রলোভনে ধরিলেও তাঁহারা পিছলিয়া পলাইয়া যান। যাহা সৎ তাহার আচরণ করাই ইঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, যাহা অসৎ তাহা ইঁহারা দেখিয়াও দেখিতে পান না। সকল সাধুভাব, সকল মঙ্গলভাব, স্বাভাবিকরূপেই ইঁহাদের অন্তরে আশ্রয় পায়; অসাধুভাব সকল হৃদয়ে প্রবেশের দ্বার পায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতার সহিত বাস করেন, আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি সংসার হইতে

অবস্থিত হইলেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি জীবনের কত পথেই ভ্রমণ করিয়াছেন, কত প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কত পাপের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে শিশুর ন্যায় সরল, অকপট, হৃদয়টি লইয়া চলিয়া আসিলেন! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়! তাঁহার যৌবন-কালে কলিকাতার কি ভয়ানক অবস্থা ছিল! আমরা বাল্যকালে এই কলিকাতা সহরকে যাহা দেখিয়াছি, তাহা এখন স্মরণ করিতেও হৃদয় কম্পিত হয়। তিনি কিরূপে এই সহরে নানা অবস্থার মধ্যে বাস করিলেন, অথচ পাপপঙ্ক তাঁহার আত্মাতে লাগিল না? এরূপ ধর্ম্মে অনুরাগ কিরূপে রাখিলেন, যাহাতে তাঁহার চিত্তটি চিরদিন সরল ও সত্যানুরাগী রহিল? জীবনের মহৎ লক্ষ্যের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশ ইহার কারণ। প্রত্যেক মহামনা ব্যক্তির জীবনে এই ঐকান্তিক অভি-নিবেশ দেখিয়াছি। যে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া পথ চলে, সে কি পথের দুই ধারে কি আছে, তাহার সংবাদ পায়? তেমনি যাঁহারা ধর্ম্মের মহা নিয়মের প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়া এই সংসার পথে চলিয়া থাকেন, এখানকার পাপ প্রলোভন কি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়? আমরা সকলেই চলিবার সময় নীচের দিকে দেখি, আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দুই চারি জন তারা-দেখা লোক না জন্মিলে আমাদের গতি কি হইত? আমি নির্জ্জনে বসিয়া যখন এই তারা—দেখা লোকদিগের বিষয় ভাবি, তখন মন বড়ই উচ্চ হয়। এই সকল মানুষের চরিত্র যেন কস্তুরীর ন্যায়, ইঁহারা যাহাকে স্পর্শ করেন তাহাতেই সুবাস মাখাইয়া দিয়া যান। চিন্তা করিয়া দেখ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশে কি সৌরভ মাখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে আমাদের চিত্ত ভরপূর হইয়া রহিয়াছে! পৃথিবীর হাতে এমন কোনও রজ্জু নাই যাহাতে এই তারা-দেখা লোকদিগকে বাঁধিতে পারে। ইঁহারা মুক্ত জীব। ইঁহারা গৃহধর্ম্ম করিয়াছেন, বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া-

ছেন, সংসারের ভাবনা চিন্তা সকল বোঝাই বহিয়াছেন, অথচ যেন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় এখানে বাস করিয়াছেন; কিছুতেই আসক্ত হন নাই। ভগবদ্গীতার উপদেশ স্বাভাবিক ভাবে ইঁহাদের জীবনে ফলিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শের প্রতি অবিচলিত দৃষ্টিই এই অনাসক্তির কারণ। তুমি যদি চরিত্রের মহত্ত্ব সাধনকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে কর এবং জীবিকার উপায় সকলকে উপলক্ষ্য মনে কর, তাহা হইলে সেই উপলক্ষ্যগুলি আর তোমাকে বাঁধিতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের ন্যায় তাঁহার মনের সর্ব্বতোমুখী গতি ছিল। রামমোহন রায় যেরূপ প্রধানতঃ ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে রত থাকিলেও, সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যের সৃষ্টি, রাজনীতির আন্দোলন প্রভৃতি সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ দেশের হিতকর সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বতোমুখী স্বদেশপ্রিয়তা প্রায় দেখা যায় না। এক সময়ে ধর্ম্ম-সংস্কার বিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযুক্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। ক্রমে নানা কারণে সে সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে চিরদিন জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে বিভাগে যখনি সাহায্যের প্রয়োজন হইত, তখনি সে বিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তিনি বদ্ধ-পরিকর হইতেন। তাঁহার প্রণীত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রথমে সুমিষ্ট সুললিত বাঙ্গালা রচনার প্রণালী প্রদর্শন করিল। তৎপরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষা সে দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই পুরাতন সংস্কৃতের ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু

এ বিষয়ে নূতন পথপ্রদর্শকের মহিমা কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? তাঁহার "সীতার বনবাসের" বাঙ্গালা কি আমরা কখনও ভুলিতে পারিব? বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহারভাগ মরণের দিন পর্য্যন্ত কি আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইবে না? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষা কি পরিমাণে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঋণী, তাহা কি নির্দ্দেশ করা যায়? একদিকে তিনি যেমন বিশুদ্ধ, কোমল, হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গলাভাষার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের মনোগত অভিপ্রায় উচ্চশিক্ষাকে কতিপয় সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, এজন্য তাঁহারা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতেছেন, অথচ অনুভব করিলেন যে, এই উচ্চশিক্ষাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক-দের জীবিকা অর্জ্জনের ও মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকদিগের উচ্চশিক্ষার্থ নিজ ব্যয়ে নিজ বাসগ্রামে এণ্ট্রান্স স্কুল ও কলিকাতায় মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করিলেন। এজন্য তাঁহাকে কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এক-দিকে তিনি যেমন শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইলেন, অপরদিকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বর্গগত প্যারীচরণ সরকার মহাশয় যখন সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহায় ও উৎসাহদাতা ছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার প্রথম সম্পাদক খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবার পরিজনের নিকট হইতে পেট্রিয়ট কিনিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে ঐ পত্রিকা অবসন্ন দশাপ্রাপ্ত হইয়া যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি মধ্যে পড়িয়া উহার

সম্পাদকতা ভার কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম উদ্যমে কৃষ্ণদাস পাল সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শের অনুগত হইয়া চলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তাতেই তিনি স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কয়েকজন ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়া "হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফণ্ড" স্থাপন করেন, যদ্বারা বহুসংখ্যক পরিবার উপকৃত হইতেছে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন এবং এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ফল কথা এই, তিনি যে কার্য্যে দেখিতেন দেশের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা তাহাতেই সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য সে কার্য্যে লাগিত। তাঁহার স্বদেশানুরাগ যেমন সর্ব্বোতোমুখীন ছিল, তাঁহার বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য সমুদয় সেইরূপ সর্ব্বতোমুখীন ছিল। তাঁহার প্রীতি ও দয়া জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি ধাবিত হইত। কোন কোন ইংরাজের সহিত তাঁহার এতদূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। ইংরাজেরা সচরাচর এদেশীয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে যিনি একবার দেখিতেন, তিনিই সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরবের জ্ঞান প্রকাশ পাইত, যে, তাঁহারা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাঁহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থের জন্যই তাঁহাদের সাহায্য চান, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দুটি জিনিসকে ইংরাজেরা বড়ই ঘৃণা করেন, প্রথমতঃ স্বার্থসাধনার্থ বন্ধুতা, দ্বিতীয় 'না' বলিবার সাহসের অভাব। বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের চরিত্রে উক্ত উভয় দোষের কোনটিই ছিল না। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পুরুষ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সততই 'না' কথাটা বলিতে সাহসী হইতেন। এজন্য ইংরাজগণ তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের সহিত মিশিবার সময়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় আত্ম-সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার চিত্তে আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান খুব প্রবল ছিল। তাঁহার কর্ম্মত্যাগের কয়েক বৎসর পরে বিধবাবিবাহের আন্দোলনের ব্যয়ভারে তিনি যখন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তৎকালীন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে আবার কর্ম্ম লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে একবার তাঁহার প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের কর্ম্ম লইবার কথা হয়। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে লিখিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত, তথাপি ইংরাজ প্রোফেসারদিগের অপেক্ষা অল্প বেতন দিলে কখনই উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। ঘোর ঋণদায়ে যখন বিব্রত তখনও তাঁহার আত্মসম্মান-জ্ঞান এত উজ্জ্বল? এই জন্যই তিনি বঙ্গসমাজের শিরোভূষণ হইতে পারিয়াছিলেন।

এই ত গেল তাঁহার চরিত্রের প্রধান প্রধান সদ্গুণের কথা; কিন্তু যে গুণের জন্য তিনি দেশের লোকের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহার উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত দয়া। এ বিষয়ের অসংখ্য গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে এবং তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে তাঁহার দয়া যে কিরূপ জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিত তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। একবার মান্দ্রাজ প্রদেশীয় দুইটি ভদ্র ঘরের ছেলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার আশয়ে বোম্বাই

সহরে যায়। সেখান হইতে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ তাহাদিগকে কলিকাতাতে আনয়ন করেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ দিকে তাহারা জাতিভ্রষ্ট, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও হঠাৎ যাইতে পারে না। খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণও তাহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন সভার অধিবেশনের দিন সেখানে গিয়া কলিকাতার দলপতি বাবুদিগকে ধরিল। তাঁহারা কেহ দুই টাকা, কেহ এক টাকা, এইরূপে কয়েক টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন। দুই জনের অভাব পক্ষে চৌদ্দ পনর টাকা চাই, তাহার মধ্যে ৮।১০ টাকা স্বাক্ষরিত হইল। যাহা স্বাক্ষরিত হইল, তাহাও আদায় হয় না; এক এক স্থানে দুই চারি বার যাইতে যাইতে তাহাদের সমুদয় সময় যাইতে লাগিল, পড়াশুনা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থাতে তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি তখন মাতৃশোকে কাতর হইয়া চিৎপুরের এক নির্জ্জন উদ্যানে একাকী বাস করিতেছিলেন। সেখানে তাহারা উপস্থিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া ও তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাহারা ভদ্রঘরের সন্তান। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, দশটি টাকা স্বাক্ষর করাইয়া তাহারা প্রায় এক মাস কাল দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া তাহাদের চাঁদার বহিখানি ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা গিয়া পড়াশুনা কর, প্রতি মাসের ২রা কি ৩রা তোমাদের জন্য ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তোমাদের বাসাতে যাইবে।" তাহারা যত দিন এখানে ছিল, ততদিন এই মাসিক ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তাহাদের জন্য আসিত। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার হৃদয় কি প্রশস্ত ও উদার ছিল!

সর্ব্বশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী প্রধান গুণের উল্লেখ করিতেছি, সেটি তাঁহার অকৃত্রিমতা। হায়! হায়! এমন স্পৃহণীয় অকৃত্রিমতা আর কোথাও দেখিব না। প্রকৃতির হাতে গড়া এমন আভাঙ্গা মানুষটি প্রায় পাওয়া যায় না। যে দুঃসময়ে আমরা পড়িয়াছি, তাহাতে এরূপ চরিত্রের মূল্য বড় অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে। কি কৃত্রিমতার মধ্যেই আমরা পড়িয়াছি! নব্য শিক্ষিতদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে চাই, মুখে নিষ্ঠা ভক্তির ছড়াছড়ি! সংবাদপত্রে স্বধর্ম্মানুরাগের ভোর জোয়ার, বক্তৃতাতে সংসার-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু কার্য্যে অসারের অসার, অন্তঃসারবিহীন, আস্থাবিহীন, নিষ্ঠাবিহীন আচরণ। নব্য শিক্ষিতদিগের সমাজের দিকে চাই, কোথায় মনুষ্যত্ব, কোথায় গাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কোথায় প্রকৃত ধর্ম্মভীরুতা! নব্যশিক্ষিতদিগের সাহিত্যের দিকে চাই, তাহা সাবানের ফেনা, ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিতেছে; ভাষার চটকে তাক লাগাইয়া দিতেছে; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রসাদে, বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া, গুছাইয়া, মনোমোহিনী করিয়া, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করিতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে মনুষ্যোচিত প্রতিজ্ঞা নাই; জীবন্ত ভাষায় জীবন্ত হৃদয়ের জীবন্ত ভাব নাই; স্বকর্ত্তব্য সাধনে যাঁহারা প্রাণ মন দিয়াছেন এমন মানুষের উক্তি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহার ভাগ পাঠ কর, অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ভূমিকা পড়িয়া দেখ, সোমপ্রকাশের পুরাতন ফাইল খুলিয়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উক্তিসকল পাঠ কর, ইঁহারা কেহই লঘুচেতা লোক ছিলেন না। প্রাণে আগুনের মত যাহা জ্বলিয়াছে, ভাষা তাহাই উদ্গীর্ণ করিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সেই সকল অংশের সহিত বর্ত্তমান সময়ের ফাঁপা ফোলা, ফেনান সাহিত্যের তুলনা কর, চক্ষে জল আসিবে; বলিবে, কি

মানুষের হাত হইতে কি সব মানুষের হাতেই পড়িয়াছি! চন্দ্র, সূর্য্য অস্ত গিয়া খদ্যোতের আলোকের উপরে নির্ভর করিতেছি! বাগ্‌দেবীর বীণাধ্বনির পরিবর্ত্তে যেন চৈত্র মাসের ঢক্কার ধ্বনি শুনিতেছি! এরূপ অসার সাহিত্য অসার খাদ্যদ্রব্যের ন্যায়, বহুমাত্রায় আহার করিলে অল্প মাত্রায় উপকার হয় এবং জাতিটা স্ফীতোদর হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অসারতা ও কৃত্রিমতার উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি স্পৃহণীয়ই বোধ হয়! প্রকৃতির হাতে গড়া আভাঙ্গা মানুষ, কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তোমরা দশজনে তাঁহাকে কি দেখিবে ও কি বলিবে তাহা তাঁহার মনেই হইত না। তিনি গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্নসম্ভূত, প্রকাণ্ড ওকবৃক্ষের ন্যায় শৈবালরাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সে তরু বাবুদের বাগানে থাকিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু তাঁহার সেই স্বভাবজাত বন্ধুরতার মধ্যেও এক প্রকার গাম্ভীর্য্য-সম্বলিত মনোহারিত্ব ছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভালবাসিতাম যে, তাঁহাতে খাঁটী, ষোল আনা মানুষটি পাইতাম। তাঁহার সকল বৃত্তিই সতেজ ও উৎকট ছিল, ভালবাসাটাও উৎকট, বিদ্বেষটাও উৎকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুতা, বাৎসল্য, দয়া, সমুদয় সতেজ ছিল, এমন প্রেমিক বন্ধু বঙ্গদেশে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি জানি না। রামতনু লাহিড়ী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার যে অবিচলিত প্রেম দেখিয়াছি, ভাষাতে তাহার বর্ণনা হয় না। বন্ধুগণকে ভালবাসিয়া, উপহার দিয়া, খাওয়াইয়া, তাঁহার কখনই তৃপ্তি হইত না। তাঁহার বন্ধুগণ পরলোকগত হইলেও তাঁহার পরিবার পরিজনকে আলিঙ্গন করিয়া

থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। তাহার একজন প্রিয় বন্ধু পরলোকগত হইলে, তিনি তাহার পরিবার পরিজনকে আপনার জ্ঞান করিতেন। একবার তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর কন্যা উন্মাদ রোগগ্রস্তা হইয়া এই খেয়াল ধরিয়াছেন, যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইব না; সেই জন্য তিনি অনাহারে আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া, ঐ বন্ধুর কন্যাকে দুই বেলা খাওয়াইতে যাইতেন। এরূপ অনেক দিন করিতে হইয়াছিল। সকল বিষয়েই এইরূপ। এরূপ মাতৃভক্ত কে কবে দেখিয়াছে? তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবীর স্বর্গারোহণ হইলে, নিকটের লোক প্রায় দুই তিন বৎসর কাল সতর্ক থাকিতেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার জননীর উল্লেখ করিতেন না; কারণ তাহা হইলে তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার প্রেম যেমন তেজস্বী ছিল, বিদ্বেষ ও তেমনই তেজস্বী ছিল। যাহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া একবার চটিতেন, তাহার নাম শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ছিল যে, বিপদে পড়িলে সেই সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একবার কলিকাতার একটি ধনী পরিবারের একটি যুবক স্বীয় পিতার সহিত বিরোধ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যায়। উক্ত যুবকের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। সে স্বীয় পিতার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ যুবকের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। ঐ যুবকের সহিত বাল্যকালে আমার আত্মীয়তা ছিল। কিছুকাল পরে আমি যখন বি, এ ক্লাশে পড়ি, তখন ঐ যুবক হঠাৎ একদিন স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম সে কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত। আমি তাহাকে স্বীয় ভবনে রাখিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে

লাগিলাম। পীড়ার অপশম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময়ে সে একদিন আমাকে বলিল,—"যদি পার আমার পিতাকে আনিয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেও; আমি তাঁহার কাছে মার্জ্জনা চাহিব।" এই অনুরোধটা আমার মনে বড়ই লাগিল। অথচ তাহার পিতার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। কাহার সাহায্যে এই ঘটনা সংঘটিত করি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষে নির্দ্ধারণ করিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গতি নাই। তাঁহার কোপের কথা জানিতাম, তথাপি তাঁহার ভালবাসার প্রতি নির্ভর করিয়া, আব্দার করিয়া ধরিব ভাবিয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কি মনে করে?" আমি বলিলাম—"একটা অনুরোধ কর্‌তে এসেছি, কিন্তু বল্‌তে ভয় কর্‌ছে।" তিনি অভয় দান করিলে অনুরোধটি জানাইলাম। এত ত অভয় দিয়াছিলেন, তথাপি তাহার নাম শুনিবামাত্র মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলেন না; আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"তুই এরূপ লোকের সঙ্গে বন্ধুতা রাখিস্, যাকে দেখ্‌লে জুতাতে ইচ্ছে করে! তার অনুরোধ আমার কাছে আনিস্! আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।" আমি সেই কুপিত সিংহের গর্জ্জনে ভীত ও স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে বলিলাম,—"যদি মহাশয়ের দ্বারা না হয়, তবে আর কাহারও দ্বারা হবে না; তবে বুঝলাম মানুষটার মৃত্যুকালের অনুরোধ রাখতে পারলাম না; আমার মুখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিলেন আমি দুঃখিত অন্তরে তাঁহার ঘর পরিত্যাগ করিতেছি। উঠিবার সময় বলিলেন,—"বোস্, যাস্ নে, কাল প্রাতে ৮টার সময় তার বাপকে তোর বাড়ীতে আন্‌বো, তুই ঘরে থাকিস্। তৎপরে যে করিয়া তিনি সেই গর্ব্বিত ধনী পিতাকে আমার ভবনে ধরিয়া

আনিলেন. তাহা বলিবার নয় ; অপর কাহার ও সাধ্যে তাহা হইত না। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ ও মিলন হইয়া গেল, তাঁহার মুখে আমি আশ্চর্য্য সন্তোষের লক্ষণ দেখিলাম। তিনি আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন,—"ওর স্ত্রীর হাতে ত কিছু নাই, দেখিস্ ওর চিকিৎসার যেন ত্রুটি হয় না, আর ওর স্ত্রী পুত্রের যেন ক্লেশ হয় না। এই দশটা টাকা রাখ্, ওর স্ত্রীকে দিস্, তুই যেন ঋণগ্রস্ত হোস নে।" আমি সে দিনের সে কথা কি জীবনে ভুলিব ? তেমন তাজা মানুষ আর দেখিব না। তিনি তাঁর কোনও প্রবৃত্তিকেই যেন কখনও রোধ করেন নাই ; সকলেই পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়াছিল। নিকটে গেলেই দোষে গুণে জড়িত আসল মানুষটি দেখিতাম, এই জন্যই তাঁহার চরিত্র চিন্তা করিতে ভাল লাগে। আমরা একবার একটি বিধবা বিবাহ দিয়া কিছুদিন সমাজের পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাদের বাসাতে প্রায় আসিতেন। আমাদের বাসার একটি যুবক তাঁহার মুখের উক্তি বলিয়া একটি কথা প্রচার করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর বলিলেন—"ওরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইতেই পারে না।" সে বলিল,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে নাই, উনি কিন্তু ও কথা বলেছেন।" এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য, অর্থাৎ সেই বালকের সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য, একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাসাতে আসিলেন। আসিয়া তুমুল ঝগড়া করিলেন। সে যুবক ও নিজের গোঁ ছাড়িল না। তিনি তাহাকে কতকগুলা কটূক্তি করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই ফিরাইতে পারিলাম না। বৈকালে আমরা সকলে সেই যুবককে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া মাপ চাহিবার জন্য তাহার নিকটে প্রেরণ করিলাম। সে গিয়া বসিয়া আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন ; আসিয়াই তাহাকে

দেখিয়া বলিলেন, "মাপ চাইতে এসেছিস্ বুঝি? আরে দুদিন সবুর কর্; প্রাতে রেগে এসেছি, দুদিন যাক্, রাগটা একটু পড়ুক!" কি অমায়িক কি অকৃত্রিম! কি মহামনা মানুষ! একবার এক বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ সভাস্থলে তাহার একজন বন্ধু নিজের একটি সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে আনিয়া তাহাকে প্রণাম করাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বেঁচে থাক মা, বিয়ে হোক্, বিধবা হও, আমি আবার বিয়ে দি।" এই আশীর্ব্বাদ শুনিয়া সভাস্থ সকলে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আরে আমার বন্ধুদের মেয়েরা বিধবা না হলে আমি বিবাহ দিব কার?" তাহার কাজ কর্ম্ম, আলাপ পরিচয়, আমোদ প্রমোদ, সকলের মধ্যে এমন এক অকৃত্রিমতা দেখিতাম, যাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা মানুষ, আমরা আসল মানুষ ধরিতে পারিলে বড় সুখী হই। এইজন্য বড় লোকদিগের জীবন চরিত পাঠ করিবার সময়ে তাহারা দশের মাঝে কি কাজ করিয়াছিলেন, প্রকাশ্য সভায় কি বলিয়াছেন, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তত ব্যগ্র হই না; কিন্তু গৃহে, পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কি করিয়াছিলেন বা কি বলিয়াছিলেন তাহা শুনিতে ভালবাসি, কারণ সেখানে আসল মানুষটি ধরিতে পারা যায়। আমাদের যে এই আসল মানুষ দেখিবার কামনা, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইয়াছিল।

পরিশেষে যে উক্তি স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাই পুনঃ স্মরণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে যাইতেছি। ঋষি ঠিক্ কথা বলিয়াছেন, মননের দ্বারা যে জীবিত থাকে, সেই প্রকৃত ভাবে জীবিত। জীবনের ধনধান্য লইয়া জীবন নহে, কে কত উপার্জ্জন করে, কে কত সঞ্চয় করে, তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতি নহে; কিন্তু কে

কি চিন্তা করে, কে কি আকাঙ্খা হৃদয়ে ধারণ করে, কে কি আদর্শ অনুসারে চলে, তাহা লইয়াই জীবনের বিচার। দৈহিক জীবনের ঘটনা সকল আজ আসে, কাল চলিয়া যায় ; সুখ বা দুঃখ চিরদিন থাকে না ; সম্পদ বিপদের মুখ সকলকেই দেখিতে হয় ; বঙ্গের প্রিয় কবি মধুসূদন বলিয়াছেন ;

"চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে !"

জীবন-নদীর নীর স্থির থাকে না ; কত অবস্থাই আসিতেছে, কত অবস্থাই যাইতেছে ; কিন্তু সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ, ঘটনা অবস্থা কেহই বৃথা আসে যায় না। কিছু রাখিয়া যায়, কিছু গড়িয়া যায়, কিছু লইয়া কিছু দিয়া যায়। লইয়া যায় জীবনের শক্তি, দিয়া যায় চরিত্র। মানুষ এ জগতে ভাবিয়া, চিন্তিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া, উঠিয়া, পড়িয়া, খাটিয়া একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইতেছে সেটা তার চরিত্র। সেটী অনিত্যের মধ্যে নিত্য, মৃত্যুর মধ্যে অমর, ধর্ম্ম সেইটিই মানুষের সঙ্গে যায়। হে মানুষ! এজগতে তুমি কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহাই তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা, তাহাই আলোচ্য ; তুমি কি খাইবে বা কি পরিবে, তোমার গৃহিনীর অঙ্গে দুইখানা অলঙ্কার থাকিবে কি দশ খানা অলঙ্কার থাকিবে, সেটা সামান্য কথা, তাহা আলোচ্যের মধ্যে নহে। তুমি দেখ, তুমি দেখ কি দাঁড়াইতেছে, জগতের পট যে তোমার চারিদিকে প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে তোমার কি ছবি পড়িতেছে ? এই চরিত্র-পদার্থ যাঁহাদের সাধনার বিষয় হয়, তাঁহারা মনন-রাজ্যেই বাস করেন এবং দেহ রাজ্যকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হস্তে যেমন হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি আর এক হস্তে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত মত ধনাগমের একটা উপায় করিতেন, কিন্তু

আপনার চরিত্রকে সর্ব্ব প্রযত্নে বাঁচাইতেন। থাক্ ধর্ম্ম, যাক্ পদ, থাক্ ধর্ম্ম, যাক্ অর্থ, থাক্ ধর্ম্ম, যাক্ বন্ধুতা, এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। ইহা বলিতে না পারিলে এ জগতে চরিত্রবান্ হওয়া যায় না। ঝড় উঠিলে কৃপণ আয়নার বাক্সটি লইয়া পলায়, জননী আপন শিশুটিকে লইয়া পলায়, যেটি যার প্রিয় তাহাকেই সে বাঁচাইবার চেষ্টা করে; বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তি বিপদের ঝড়ে সর্ব্বাগ্রে আপনার চরিত্র বাঁচাইবার চেষ্টা করেন, ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া পলান, কারণ ধর্ম্মই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ যে দেশে উত্থিত হন সে দেশ ত্বরায় মহত্ত্ব ও গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর করুন, আমাদের দেশ সেই গৌরব-পদবীতে উন্নীত হউক। এইরূপ সোজা-পথে চলা, তারা-দেখা ও আলেয়ার পিছে ছোটা মানুষ আমাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে আসুন।

নৈসর্গিক ধর্ম্ম।

আপামরসাধারণ যে মানুষকেই জিজ্ঞাসা করি, কেহই জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সকলেই অনুভব করে এ জীবনটা যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। আমরা বাহির হইতে যে জীবনে পূর্ণতা দেখিতেছি, তাহাতেও এমন কিছুর অভাব রহিয়াছে, যাহাতে তাহা সে জীবনধারীর নিকট অঙ্গহীন বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। তবেই ত দেখা যাইতেছে মনুষ্যমাত্রের অন্তরে এমন একটা কিছু রহিয়াছে যদ্দ্বারা প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় জীবনকে বিচার করিয়া তাহাকে হীন বলিয়া প্রতীতি করিতেছে। যদি কেহ বাজারে বেদানাটি কিনিতে গিয়া, টিপিয়া, হাতে ওজন করিয়া বলে, এটি প্রকৃত বেদানা নয়, তাহাতে কি প্রকাশ পায়? ইহাই কি প্রমাণিত হয় না যে, সে প্রকৃত বেদানার লক্ষণ জানে এবং তদ্দ্বারাই উক্ত বেদানাটিকে বিচার করিতেছে? সেইরূপ তুমি যখন বলিতেছ,—"হায়! জীবনটা মনের মত হইল না।" তখন কি প্রকাশ পাইতেছে না যে, মনের মত জীবন যাহাকে বলে, তাহার একটা আদর্শ তোমার মনে লুকাইয়া রহিয়াছে? জীবনের প্রতি অসন্তোষ যদি সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই দেখ, তাহাতে কি এই প্রমাণ হয় না যে, পূর্ণ বা প্রকৃত উন্নত জীবনের আদর্শ সর্ব্বসাধারণের মনেই নিহিত আছে? চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, যে, নিজ নিজ জীবন সম্বন্ধে যেমন এক প্রকার অতৃপ্তি বা অসন্তোষ সর্ব্বসাধারণের মনেই আছে, তেমনি মানব-সমাজ সম্বন্ধে একপ্রকার অসন্তোষ মানবমাত্রেরই মনে রহিয়াছে। আমরা সমাজ না হইলে থাকিতে পারি না, কিন্তু কেহই সমাজের প্রতি সন্তুষ্ট নহি। মানব-কুলের দুষ্কৃতির

আঘাতে আমাদের প্রত্যেকেরই চিত্ত সতত চঞ্চল। আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি, যে সমাজটা চারিদিকে দেখিতেছি এটা ছাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, আগে যাহা ছিল তাহা ভাল; কেহ কেহ বলিতেছেন, পরে যাহা আসিতেছে, তাহা ভাল; কিন্তু উভয় শ্রেণীর এক বিষয়ে ঐক্য দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান সমাজটা ছাই। এখন যদি প্রশ্ন করা যায়, তোমরা কি করিয়া জানিলে বর্ত্তমান সমাজটা ছাই, তোমাদের নিকট কি মাপের কাঠি আছে, যাহা দিয়া মাপিয়া দেখিয়াছ যে বর্ত্তমান সমাজ অনেকাংশে হীন, তবে তাহার কি উত্তর পাই? নিশ্চয়ই সকলের অন্তরে কোন ও একটা মাপের ঠিক আছে। এই যে মানবের হৃন্নিহিত অপরিস্ফুট বেদনা, এই যে গূঢ় গভীর অতৃপ্তি, এই যে স্বতঃপ্রণোদিত হৃদয়াভ্যন্তরালবর্ত্তী আদর্শের সহিত তুলনা, ইহা আর কিছুই নহে, ইহা আত্মা ও পরমাত্মার গূঢ় গভীর যোগের নিদর্শন স্বরূপ, পরমাত্ম-প্রভাবের সূচনা মাত্র। যেমন নদীর জোয়ারভাঁটা দেখিয়া অনুভব করিয়া থাক, যে সিন্ধুর সহিত তাহার যোগ আছে; এবং জোয়ারের জল উদ্বেলিত সিন্ধুর প্রেরণাপাত্র, তেমনই এই যে মানবহৃদয়ের প্রধূমিত আকাঙ্খা ইহাকে ও অনুভব কর, যে ইহা পরমাত্মার প্রেরণামাত্র। যেমন জল স্বভাবতঃ নিম্নগামী তেমনি মানবাত্মা ও স্বভাবতঃ ধর্ম্মান্বেষী।

মানবাত্মা যে স্বভাবতঃ ধর্ম্মান্বেষী, তাহা বিবিধ প্রকারে প্রমাণিত হয়। যে পতিত হয়, যে ধর্ম্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয়, সে ও মনে মনে বলে,—"আমার না পড়িলেই ভাল হইত।" পতন জন্য তাহার প্রতি লোকের যে অশ্রদ্ধা তাহা সে নিজেই স্বাভাবিক বলিয়া অনুভব করে, এবং তজ্জনিত যে সামাজিক শাস্তি আসে, তাহাকে সে বহন করিতে প্রস্তুত হয়। মানব-হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে যদি ধর্ম্মের এরূপ অনুগত না হইত, তাহা হইলে কে মানব-সমাজ মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারিত? সকল

সমাজেই দেখি, অল্পসংখ্যক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি বহুসংখ্যক শান্তিপ্রিয় মনুষ্যকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে। একজন তাঁতিয়া ভীল সমগ্র মধ্য প্রদেশের মানুষকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অনেকে মনে করে জনসমাজে পাপী দুরাচার মানুষের সংখ্যাই অধিক। তাহা যদি হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে, অল্পসংখ্যক সাধু-প্রকৃতির মানুষ বহুসংখ্যক দুষ্ক্রিয়াসক্ত মানুষকে ধরিতেছে, বাঁধিতেছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতেছে। ইহা কি বিচিত্র দৃশ্য! ইহা কি গভীররূপে চিন্তা করিবার একটা বিষয় নয়? জগতে অধার্ম্মিকদের সংখ্যা যদি অধিক হয়, তবে শক্তি অধিক হয় না কেন? কেন অধার্ম্মিকগণ দলবদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে শাসনে রাখিয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারে না? মনুষ্যসমাজ যে আছে, ইহাতেই প্রমাণ যে অধার্ম্মিকগণ শাসনাধীন থাকিতেছে। কুকুরটির গলায় তুমি বকলসটি দিতে যাইতেছ, সে যদি ঘাড় পাতিয়া সেটি লয়, তাহাতেই প্রমাণ যে সে দেখিয়াছে যে, তোমার এমন শক্তি আছে, যাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই; তেমনি অধার্ম্মিকগণ কি জানে যে, জন সমাজের অন্তরালে কোথায় এমন শক্তি আছে? যাহার জয় অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য নতুবা সাজা মস্তক পাতিয়া লয় কেন?

ধর্ম্মের জয়ের এই অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতার জ্ঞান কি মানবের প্রকৃতিনিহিত নয়? রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থের প্রতি এ দেশের সর্ব্বসাধারণের এত শ্রদ্ধা ভক্তি কেন? তাহা কি এই জন্য নয় যে, এই উভয় গ্রন্থেরই উপদেশ এই,—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ? রামায়ণের কবি দেখাইতেছেন, এক দিকে অরণ্যচারী, রাজ্যভ্রষ্ট ও কতিপয় কপি-সৈন্যমাত্র-সহায় রাম, অপর দিকে লঙ্কেশ্বর রাবণ, যার প্রতাপে স্বর্গমর্ত্ত্য কম্পিত ও যার দ্বারে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ বাঁধা; পৃথিবীর গণনায়, বিষয়-বুদ্ধির বিচারে, কে ভাবিতে পারিত, কবি দেখাইয়া না দিলে

কে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিত যে, এই কপিসহায়, অরণ্যচারী রামের হস্তে এই রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে? অথচ তাহাই হইল! নিজ বলদর্পে পাপকে বরণ করিয়া রাবণের এই হইল যে,

"এক লক্ষ পুত্র তার সোয়া লক্ষ নাতি,
এক প্রাণী না রহিল বংশে দিতে বাতি।"

কি ভয়ঙ্কর শাস্তি! ঋষি মুখে বলিলেন না, কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে দিলেন,—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

মহাভারতেরও সেই কথা। কুরুপাণ্ডবেরা যুদ্ধোন্মুখ, কৃষ্ণ দ্বারকা-পুরীতে বাস করিতেছেন; তিনি উভয় পক্ষের বন্ধু, কুটুম্বিতাসূত্রে উভয়েরই আত্মীয়, উভয় পক্ষই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কৃষ্ণ কি করেন! তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন; এক দিকে আপনাকে ও অপর দিকে আপনার নারায়ণী সেনা রাখিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, আমি উভয়েরই বন্ধু; এক পক্ষ আমাকে লউক, অপর পক্ষ আমার নারায়ণী সেনা লউক। দুর্য্যোধন স্থূলমতি, বিষয়-বুদ্ধির পরবশ, পার্থিব ধনের প্রতিই তাঁহার অধিক দৃষ্টি, তিনি মনে করিলেন একা কৃষ্ণ লইয়া কি করিব? এক বাণের কর্ম্ম বৈ ত নয়; একা কৃষ্ণ গেলেই ত গেল; আমি নারায়ণী সেনাই লই; ইহারা একজন এক একটি বীর, ইহাদের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া কুরুরাজ নারায়ণী সেনা লইতে চাহিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, তথাস্তু। পাণ্ডব-সখা পাণ্ডবদিগেরই রহিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথ্যে বরণ করিয়াছেন শুনিয়া প্রজাবৃন্দের মধ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণ নারায়ণী সেনা ফেলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু এমন কিছু লইয়া গেলেন যাহা মহা বিশাল সৈন্যদল অপেক্ষাও বলবত্তর; যাহার গুণে একা মানুষ লক্ষাধিক মানুষের অপেক্ষা বলশালী হয়! তাহা কৃষ্ণের চরিত্রের

প্রভাব ; তাহা কৃষ্ণের প্রতি প্রজাবৃন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর ; যাহা প্রজাবৃন্দের উক্তিতে প্রকাশ পাইল ;—

জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

অর্থ— জয়, জয়, স্থির জানি পাণ্ডবের জয় ;
যে পক্ষে আপনি হরি নিলেন আশ্রয়।

প্রজাদের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইল। ভারতসাম্রাজ্যাধিপতি, অতুল বিভবের স্বামী, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-প্রভৃতি মহারথিগণবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, ঐ বনবাসী, গৃহতাড়িত, কতিপয় পাণ্ডবের হস্তে স্ববংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আর এক ঋষি মুখে বলিলেন না, কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে দিলেন,—"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।"

সত্যই কি ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী? উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিতেছেন;

"সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি"

অর্থ—যে অনৃত, অসত্য বা অধর্ম্মকে বলে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়,—তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশের ঋষিগণ যে সাক্ষ্য দিতেছেন, অপর দেশের ঋষিগণও সেই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

য়িহুদীরাজ David প্রণীত Psalms এর মধ্যে আছে ;—

A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arrows of the wicked shall be broken; but the Lord upholdeth the righteous.

অর্থ—ধার্ম্মিক মানুষের যে স্বল্প সম্পত্তি আছে, তাহা বহুসংখ্যক অধার্ম্মিক লোকের প্রচুর বিভব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ অধার্ম্মিকদিগের প্রতাপ চূর্ণ হইবে এবং প্রভু ঈশ্বর ধার্ম্মিকদিগকে জয়শালী করিবেন।

সর্ব্ব দেশের ঋষিগণের একই সাক্ষ্য। তাঁহারা জনগণকে বলিতে-ছেন, তোমরা আশান্বিত হও, ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মের জয় কি বাস্তবিক অবশ্যম্ভাবী? সংসারী মানুষকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা এরূপ কথা বলে না। চারিদিকে জন-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর, সর্ব্বস্থলেই ধর্ম্মের জয় দেখা যায় না। প্রতিদিন, প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, ধনী দরিদ্রকে পীড়ন করিতেছে, অন্যায়পূর্ব্বক পরস্ব হরণ করি-তেছে, করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাস করিতেছে, উত্তরাধিকারিগণের জন্য সম্পদ ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যাইতেছে; গৃহে গৃহে দুরাচার পুরুষ সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে, এবং স্বীয় বলদর্পে কাল কাটাইয়া যাইতেছে; জগতের বিস্তীর্ণ বাসভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, প্রবল জাতিগণ দুর্ব্বল জাতিদিগের গলে পা দিয়া তাহাদের স্বাধীনতা ও অর্থ হরণ করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিতেছে ও সুখে বাস করিতেছে কৈ, জগতের কার্য্যকলাপে ত দেখি না যে, সর্ব্বত্র ধর্ম্মই জয়যুক্ত হই-তেছে? তবে কি ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী?

ভাবিয়া দেখ, যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ এ কথাটা মানবপ্রকৃতিতে এমনি নিহিত যে, মানুষ এ কথা শুনিতেও ভালবাসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, রামায়ণের যদি ধর্ম্মের জয় না দেখাইয়া অধর্ম্মের জয় দেখাইতেন, যদি রামায়ণের উপসংহার এই হইত যে, রাবণ সীতাকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখে বাস করিতে লাগিল, রাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে ফিরিয়া গেলেন ও অজ্ঞাতবাসে মরিলেন; অথবা মহাভারতকার যদি এই দেখাইতের যে, পাণ্ডবগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইয়াই রহিলেন এবং দুর্য্যোধন চিরদিন রাজলক্ষ্মী ভোগ করিয়া গেলেন, তাহা হইলে কাব্যাংশে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কি কোনও দোষস্পর্শ হইত? তাহা হইত না। কারণ তাহা হইলে

প্রতিদিন জগতে যাহা ঘটিতেছে, তাহারই অনুরূপ বর্ণনা হইত। যে উপন্যাস মানবপ্রকৃতিকে ও মানবসমাজকে যথাযথ চিত্রিত করে, তাহারই ত প্রশংসা হয়। সে ভাবে উক্ত গ্রন্থদ্বয় হয় ত তখনও প্রশংসনীয় হইত; কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, তাহা হইলে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতাম না; তাহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া আদর করিতাম না; তাহারা কোন্ দিন বিস্মৃতির জলে ডুবিয়া যাইত। উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে আমরা এতকাল ধরিয়া এই জন্য ভালবাসিতেছি যে, উহারা আমাদিগকে সাহস করিয়া বলিয়াছে, যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ! তবে ত দেখিতেছি, আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যে জন্য আমরা শুনিতে ভালবাসি —যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। এ কথা যিনি বলেন, তিনি আমাদের হৃদয়কে অধিকার করেন, তিনি আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তিনি আমাদিগকে আপনার করিয়া লন।

মানব মনের উপরে জগতের মহাজনদিগের, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধুদিগের যে এত প্রভাব, তাহার মূলে কি? জগতের দিকে চাহিয়া বল— বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক চৈতন্য প্রভৃতির প্রজাসংখ্যক অধিক কি ইংলণ্ডের রাজেশ্বরেরপ্রজা সংখ্যা অধিক? এক রাজ্য পৃথিবীর ভূমির উপর, অপর রাজ্য মানবের প্রাণের উপর। কোন্ রাজ্যের ভিত্তি গভীর স্থানে নিহিত? সিকন্দর, সীজার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীকে জয় করিতে এবং স্বীয় স্বীয় সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই। কিন্তু দুই সহস্র বৎসর হইল, জুডিয়া দেশের এক অশ্বশালাতে এক সূত্রধর-তনয় জন্মিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; এখনও জগতের কত কত রাজার মণি-মণ্ডিত মুকুট ঐ সূত্রধর-তনয়ের চরণের উদ্দেশ্যে লুণ্ঠিত হইতেছে। এই সকল সাধুগণের এত

প্রভাবের মূল কারণ কোথায় ? আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আরও বিস্মিত হইতে হইবে যে, সিকন্দর, সীজার, বা নেপোলিয়ান অনুযাত্রিক সৈন্যদল সংগ্রহ করিবার সময় তাহাদিগকে কত পার্থিব প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন ; নূতন নূতন দেশ দেখিবে, লুট-তরাজ করিতে পারিবে, সমরশ্রী তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে ; গৌরব, সম্মান, বিভব লাভ করিয়া ফিরিতে পারিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এত প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁহারা আবশ্যকমত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই ; বরং সময়ে সময়ে সংগৃহীত সৈনাদিগকে স্বীয় বশে রাখিতে কষ্ট পাইতে হইয়াছে ; কিন্তু মানবের এই ঈশ্বর-নিযুক্ত গুরুগণ শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন, "যদি আমাদের অনুবর্ত্তী হইতে চাও, দারিদ্র্যকে বরণ কর, নির্য্যাতনকে মস্তকের ভূষণ কর, আহত বা হত হইবার জন্য প্রস্তুত হও।" অথচ লক্ষ লক্ষ লোক সেই পথানুবর্ত্তী হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য ! স্বার্থ অপেক্ষা স্বার্থনাশের, সুখ অপেক্ষা দুঃখের, সম্পদ্ অপেক্ষা দারিদ্র্যের আকর্ষণ অধিক ! ইহার ভিতরের কারণ কি ? মহাজনদিগের কোন্ কথা শুনিয়া লোকে ভুলিয়াছে ? কি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছে ? সে কথাটাও এই কথা, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ !" যখন মানুষ চারিদিকে অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, পাপতাপের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সাধুরা তাহাদের কর্ণে উচ্চৈঃ-স্বরে বলিয়াছেন,—"ভয় নাই—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ ! আশান্বিত হও, তোমরা মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে না ; ভারাক্রান্ত, পরিশ্রান্ত যে যেখানে আছ, আমাদের নিকট আগমন কর, আমরা তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব।" আমি জিজ্ঞাসা করি, হে পৃথিবীর ক্লান্ত জীব মানব ! হে পাপপ্রবৃত্তির ক্রীড়ার পুতুল মানব ! আজ যদি তোমার কর্ণে সুগম্ভীর নাদে এরূপ তূরীর ধ্বনি আসে, তুমি কি স্থির থাকিতে পার ?

তবে আর এক দিক্ দিয়াও দেখিতেছি, মানবপ্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহা ধর্ম্মের জয় দেখিতে চায়, ধর্ম্মের জয় হইবে ইহা শুনিতেও ভালবাসে, ভাবিতেও ভালবাসে, এরূপ কথা যে সাহস করিয়া বলে ও সেই বিশ্বাসে আপনাকে অর্পণ করিতে পারে, তাহার চরণে দাস হইতেও ভালবাসে।

ঈশ্বর মানব প্রকৃতিকে ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছেন। চীন দেশের একজন রাজা একবার মহামতি কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বিজ্ঞবর রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষার জন্য কি সময়ে সময়ে দুর্বৃত্ত লোক-দিগকে হত্যা করা আবশ্যক হয় না?" কংফুচ উত্তর করিলেন—"হে রাজন্, আপনি হত্যার বিষয়ে চিন্তা করিবেন কেন? আপনি ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করুন, দেখিবেন বায়ুর অগ্রে শস্যক্ষেত্র যেমন স্বভাবতঃ নত হয়, তেমনি আপনার অগ্রে প্রজাকুল স্বভাবতঃ নত হইবে।" এ কথার অর্থও এই, মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মের অনুগত, সকল জ্ঞানী মানুষ ইহা অনুভব-করিয়াছেন, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছেন, সকল গুরুই এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ইমানুয়েল ক্যাণ্ট এক স্থানে বলিয়াছেন—"দুইটি বিষয় আমাকে গভীর বিস্ময়ে পূর্ণ করে, নক্ষত্রখচিত আকাশ ও মানবের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধি।" ঠিক্! ঠিক্! মানবের হৃদয়নিহিত এই ধর্ম্মানুরাগ আকাশের ন্যায় অপরিসীম।

মানবপ্রকৃতি ধর্ম্মের অনুগত ও ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ, এই ভৌতিক প্রকৃতির মধ্যে যেমন এমন কিছু আছে, যাহার গুণে প্রস্তর খণ্ডকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেই ভূপৃষ্ঠে পড়িবেই পড়িবে ইহা যেমন বলা যায়, তেমনি মানব প্রকৃতির মধ্যেও এমন কিছু নিহিত আছে, যাহাতে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিবেই দিবে, ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। ইহার অর্থ কি এই নয় যে, মানবের জীবন এক ধর্ম্মাবহ শক্তি বা পুরুষের হস্তে? এই জন্যই উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিয়াছেন,—"স

সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"। তিনিই সেতুস্বরূপ হইয়া লোক সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছেন না।

জনসমাজের স্থিতির মূলে তিনি। তিনিই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছেন। তুমি যেরূপেই এই ধর্ম্মাবহ পুরুষের হাত এড়াইতে চাওনা কেন, যে কোনও যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে ভুলাইতে চাওনা কেন, সংশয় ও নাস্তিকতার দ্বারা আপনাকে যতই আবরণ করিবার প্রয়াস পাওনা কেন, সে কেবল উটপক্ষীর বালুকারাশির মধ্যে মুখ লুকান মাত্র। উটপক্ষীর বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে, যে যখন কোনও শত্রু তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তখন কিয়ৎক্ষণ দৌড়িয়া যখন সে দেখে যে, তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার আর উপায় নাই, তখন বালুকারাশির মধ্যে স্বীয় মস্তক লুকাইয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করে। তেমনি অনেক লঘুচিত্ত মানুষ এই ধর্ম্মাবহ পুরুষের হাত এড়াইবার উপায় না দেখিয়া অজ্ঞতা ও চিন্তাহীনতার বালুকারাশির মধ্যে মস্তক লুকাইয়া চক্ষুকে অন্ধ করিয়া, স্বীয় স্বীয় আত্মাকে বলিতে থাকে, "ঈশ্বর নাই!"

মানব-জীবন যে মহানিয়মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতি অনুশীলন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূতের নৈসর্গিক ক্রিয়ার ন্যায় এই ধর্ম্ম-নিয়মের নৈসর্গিক ক্রিয়াও নিরন্তর চলিতেছে। যেমন ভৌতিক শক্তির নৈসর্গিক কার্য্যের ফলেই ভূপৃষ্ঠে কোথাও গিরি-গহন, কোথাও মরু-প্রান্তর প্রভৃতি প্রকৃতির ভীম ও কান্ত দৃশ্যাবলী প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি এই মানবের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাবের নৈসর্গিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধর্ম্ম-গ্রন্থ, ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদিগকে এক আকারে ভগ্ন কর, আর এক আকারে ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। যদি এরূপ একদল লোক এখন দেখা দেয়, যাহারা বলে যে, তাহারা বিবাহের বিধি রাখিবে

না, নরনারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত রাখিবে, তাহা হইলে কি তাহারা প্রণয় ও দাম্পত্যধর্ম্ম তুলিয়া দিতে পারে? বরং ইহাই কি সত্য নয় যে, বিবাহের রীতি ও প্রণালী এক আকারে ভাঙ্গিয়া আর এক আকারে অভ্যুদিত হয়। তখনও দেখা যায়, নরনারী প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছে, একসঙ্গে বাস করিতেছে, গৃহ ও পরিবার রচনা করিতেছে, এবং ব্যভিচারকে নিন্দার্হ মনে করিতেছে। মানব-হৃদয় হইতে প্রণয়কে তুলিয়া লইতে না পারিলে বিবাহ ও দাম্পত্য-ধর্ম্মকে তুলিয়া লইবার উপায় নাই। সেইরূপ মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভাবকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম সম্প্রদায়, ধর্ম্মালয়, ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতিকে বিলুপ্ত করিবার উপায় নাই। যেমন নদীর কূলস্থিত ভূমি এক আকারে ভাঙ্গিয়া দূরে গিয়া জলস্রোতের নৈসর্গিক ক্রিয়াবশতঃ পুলিনরূপে আর এক আকারে গড়ে, তেমনি মানব-সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মসাধনকে, লোকাচারকে, ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাবের নৈসর্গিক ক্রিয়াবশতঃ কিয়ৎকালানন্তর আর এক আকারে গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে।

অতএব বলি, মানব-জীবন ধর্ম্ম নিয়ম দ্বারা অনিবার্য্যরূপে শাসিত, ইহা যদি সত্য হয়, তবে যত শীঘ্র পার, ব্যক্তিগত জীবনকে ও সামাজিক জীবনকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিবার চেষ্টা কর। কিছু বজায় রাখিবার জন্য, নিজের মনের মত একটা ঘটাইবার জন্য, যাহা আছে তাহার একটা সুযুক্তি বাহির করিবার জন্য, নিজের স্বার্থের সঙ্গে ধর্ম্মকে মিলাইবার জন্য, বাগ্‌বিতণ্ডা কেবল বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র। ধর্ম্মের একটা সার নিয়ম এই, যাহা অসৎ তাহাকে বর্জ্জন কর, যাহা সৎ তাহাকে বরণ কর। অবশ্য আমি যাহাকে সৎ বলি, তুমি তাহাকে সৎ না বলিতে পার, কিন্তু অন্ততঃ আপনার নিকট খাঁটি থাক; নির্ম্মল হৃদয়ে ঈশ্বরের জগতে বাস কর; অকপটচিত্তে ধর্ম্মের অনুসরণ কর। কূটতর্ক তুলিয়া আত্মাকে শান্ত

করিবার চেষ্টা করা, বা কর্জ্জ করা বিশ্বাস দ্বারা চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাওয়া, ক্রন্দন-পরায়ণ শিশুকে আফিং খাওয়াইয়া ঘুম পাড়ানর ন্যায়। সে ক্ষণকালের জন্য ঘুমাইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার গুরুতর অনিষ্টই সাধিত হয়।

ধর্ম্মের ভূমি স্বাধীনতার ভূমি। কে কি শিখাইয়াছে, কে কোথায় জীবনকে কিসের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কোন্ দিকে স্বার্থের কোন্ ক্ষতি লাভ আছে, তাহা ভুলিয়া ধর্ম্মকে চিন্তা করিতে হয়। আমরা ধর্ম্মকে ও সমাজকে রাখিবার জন্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হই। সে জন্য এতটা ব্যস্ত না হইয়া আপনাদিগকে রাখিবার জন্য কিছু ব্যস্ত হইলে ভাল হয়। ধর্ম্ম আপনাকে আপনি রাখিতে জানেন। জন-সমাজের জন্য ভাবিও না; তাহারও একজন রক্ষাকর্ত্তা আছেন। তুমি আমি বুদ্বুদের মত সমাজসাগরবক্ষে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছি। মনে কি কর, এই তোমার আমার উপর ধর্ম্মের থাকা-না-থাকা নির্ভর করিতেছে? হে বুদ্বুদ! সমাজ থাকা-না-থাকার জন্য এতটা ভাবিও না; তোমাকে যিনি রাখিতেছেন তিনি ধর্ম্মকে ও সমাজকে রাখিতেছেন। তুমি সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাকে রাখ, তাহা হইলেই সকল দিক্ থাকিবে।

ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপিতা, সর্ব্বপ্রাণতা, অনিবার্য্যতা অনুলঙ্ঘনীয়তা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করি না বলিয়াই ইহা হইতে ভ্রষ্ট হই। শিশু মায়ের হাত ছাড়াইয়া প্রাঙ্গনে পলাইয়া যায়; যদি মনে থাকিত যে, মায়ের সঙ্গে ছুটিয়া পারিবে না, ধৃত হওয়া অনিবার্য্য, তাহা হইলে আর পলাইত না। তেমনি তুমি আমি যদি সর্ব্বদাই স্মরণে রাখিতে পারিতাম যে, ধর্ম্ম নিয়ম অনিবার্য্য অনুল্লঙ্ঘনীয়, তাহা হইলে আর প্রবৃত্তির হস্তে আপনাদিগকে অর্পণ করিতাম না, ইহা কি সত্য নয়?

আসল ও নকল।

আমরা যদি মিথ্যাতে এতটা বিশ্বাস না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হইত। এ জগতে এক প্রকার হইয়া আর এক প্রকার দেখান যায়, এবং দেখাইয়া মানুষকে চিরপ্রবঞ্চনার মধ্যে রাখিতে পারা যায়, ইহা যদি মানুষ না ভাবিত তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ তাহা হইলে মানুষ নকল ছাড়িয়া আসলটা ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইত। আমরা অনেকে যে এ জগতে সারবান্ চরিত্র লাভ করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, নিরেট খাঁটী বস্তুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অল্প। নিরেট খাঁটি বস্তুটুকুই জগতে থাকে, জগতে দাঁড়ায় ও কাজ করে; নকল যাহা তাহা তুষের ন্যায় বায়ুতে উড়িয়া যায়, চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

বিধাতা এ জগতে আসলে নকলে, আলোকে অন্ধকারে, সাধুতাতে ও অসাধুতাতে কেন মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। রামের সঙ্গে একটা রাবণ কেন আছে, তাহা সম্পূর্ণ জানি না। বোধ হয় এই জন্য যে রাবণকে না দেখিলে রামের মূল্য ভাল করিয়া বুঝা যায় না; রাবণকে পরিহার করিয়া রামকে ধরিতে হইবে, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না; কিংবা এ কথাতেও কিছু সত্য থাকিতে পারে যে, পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিলে পুণ্যের বল বাড়ে না। আমি একবার একটী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বক্তা বলিলেন, মানবের যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহার সকলের সঙ্গেই অসার ভাগ আছে, অর্থাৎ যাহা পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা দৈহিক ধাতুপুঞ্জের সহিত একীভূত হয় না, যাহাকে সময়ান্তরে দেহ হইতে বর্জ্জন করিতে হয়, এমন অনেক দ্রব্য

আছে। এখন প্রশ্ন এই, যাহা অসার, যাহা এক সময় দেহ হইতে বর্জ্জন করিতেই হইবে, তাহা মানবের খাদ্যের সহিত মিশিয়া রহিল কেন? প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলিলেন, ঐ অসার ভাগগুলি থাকার জন্য সার ভাগগুলি কার্য্য করিতে পায়, ওগুলি না থাকিলে পুষ্টিকর সামগ্রীগুলি সে প্রকার জোরের সহিত কার্য্য করিতে পারিত না। তৎপরে এবিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি। অনুভব করিয়াছি যে বিধাতার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে এরূপ ব্যবস্থাই আছে, যে একটী সারবস্তুকে বলবান করিবার জন্য দশটী অসার বস্তু তাহার চারিদিকে থাকে। যেমন মানুষ যখন পাখীটীকে মারিবার জন্য বন্দুকে গুলি পোরে, তখন অনেক সময়ে দেখি যে এক মুঠা গুলি তাহার মধ্যে দিল; কিন্তু পাখীটী যখন মরে, তখন একটী বা দুইটী গুলিতেই মরে; যদি সে বিংশতিটী গুলি বন্দুকের মধ্যে দিয়া থাকে, তবে দুইটী কাজে লাগিল আর অষ্টাদশটী বৃথা গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা কি গেল? কথনই না। সেই অষ্টাদশটী গুলি বন্দুকের মধ্যে থাকাতে সংঘর্ষণের প্রভাবে অপর দুইটীর বলবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে; সেইরূপ চিন্তা করিয়া দেখ, এজগতে যত প্রাণী জন্মিতেছে, সকলে কি কাজ করিতেছে? যত প্রাণী এ জগতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলে যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অচির কালের মধ্যে ভুবন ভরিয়া যায়। অধিক কি, পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে হস্তীর শাবক অনেক বিলম্বে হয়, সেই হস্তীর শাবক সকল যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে একশত বৎসরে হস্তীতে জগতের অধিকাংশ স্থান ভরিয়া যায়। বর্ষাকালে আমরা পথে ঘাটে কত ভেক-শিশু দেখিতে পাই; দেখি কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক চারিদিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছে; অন্যমনস্ক ভাবে পা বাড়াইতে গেলেই, তাহাদিগকে মাড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অথবা শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে কোন কোন সময়ে গঙ্গার জলে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলীরক

দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, কলসটী বুড়াইতে গেলেই তন্মধ্যে অনেক কুলীরক যায়। কাপড় দিয়া জল ছাঁকিলেই রাশি রাশি কুলীরক উঠে। এখন প্রশ্ন এই, এত ভেকশিশু বা এত কুলীরক কোথায় যায়? সকলগুলি কি জীবিত থাকে? সকলগুলি জীবিত থাকিলে কি আর আমরা পা বাড়াইতে পারি, বা গঙ্গাজলে অবগাহন করিতে পারি? নিশ্চয় এতগুলির জন্ম বাঁচিবার জন্য নহে, অল্পসংখ্যক থাকিবে, বহুসংখ্যক মরিবে এই জন্য। এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি তাহারা মরিবে তবে বিধাতা তাহাদিগকে জগতে আনিলেন কেন? অষ্টাদশটীর দ্বারা দুইটীকে বলবান করিয়া লইবেন বলিয়াই তাহাদের সৃষ্টি। ইহাকেই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, জীবন-সংগ্রাম।

জীবন-সংগ্রাম যেমন জীব-জগতে আছে, যে জীব চলিয়া যায়, সে যে থাকে তাহাকে সবল করিয়া যায়, আসলকে বলশালী করিয়া রাখিয়া যায়। রাবণ মরিয়া যায়, কিন্তু রামকে জয়শালী করিয়া যায়। বিধাতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, মানব জীবনে দেখিতেছি, মানব ইতিবৃত্তে দেখিতেছি, ঈশ্বরের এই সত্যময় জগতে নকলের, অসত্যের, বাঁচিবার আশা নাই। ইহা দেখিয়াই ঋষিরা বলিয়াছিলেন ;—

"সমূলো বা এস পরিশুষ্যতি যোনৃত মভিবদতি।"

যে অসত্যকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। অর্থাৎ মূলহীন বৃক্ষের যেমন যেমন এ জগতে বাঁচিবার উপায় না, তেমনি যাহা মিথ্যা যাহা অসত্য, যাহা নকল, তাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। তবে নকল কিছুকাল আসলকে ঘিরিয়া তাহার শক্তি ও মূল্য বাড়াইয়া দেয় এইমাত্র। সকল মানব সমাজে ঘুরিয়া বেড়ায় বটে, চাকচিক্যদ্বারা অনেক সময়ে চিত্ত হরণ করে বটে, কিন্তু মানব প্রকৃতি কাহাকে চায়? কাহার আদর

করে? গতবারে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, জগতের সাধুমহাজনের শিষ্য-সংখ্যা যে এত, তাহাতে কি প্রমাণ হয়? জগতের লোক তাহাকে কেন ধরিয়াছে? জগতে ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান, কৃতী, যশস্বী লোক ত কত জন্মিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে জগদ্বাসী এত যায় নাই কেন? এক একজন সাধুর পশ্চাৎ হইতে মানুষদিগকে ফিরাইবার জন্য কি চেষ্টাই না হইয়াছে? যীশুর শিষ্যগণ যখন একটী ক্ষুদ্রমণ্ডলীবদ্ধ হইয়া মাথা তুলিলেন, তখন উঠিয়াই দুইটী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার হইল। প্রথম গ্রীকদিগের সভ্যতা ও জ্ঞানাভিমান, দ্বিতীয় রোম সাম্রাজ্যের রাজশক্তি। গ্রীকজ্ঞানাভিমানগণ এই নব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অজ্ঞ বলিয়া হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন; রোমের রাজভক্তি দেববিদ্বেষী জ্ঞানে ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাসত্ত্বেও সেই সূত্রধর-তনয়ের রাজ্য ও প্রজা-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইহা কি ইতিহাসের একটা আশ্চর্য্য ঘটনা নয়? রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রামকে হতচেতন করিয়া, ভাবিয়া গেল, যে রাম মরিয়াছে, পরক্ষণেই সংবাদ আসিল, রাম আবার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান, তখন রাবণ বলিল :—

"মরিলেও না মরে রাম এ কেমন বৈরী?"

জগতের সাধুদের শক্তি সম্বন্ধে কি এই দশা ঘটে নাই? যখন পৃথিবীর রাজারা ভাবিতেছেন, আগুন নিবাইয়াছি, বিনাশ করিয়াছি. তখন আর একদিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। রোমের সম্রাট খৃষ্টিয়ানের দল নিঃশেষ করিবার জন্য রাজবিধি প্রচার করিলেন; ওদিকে তাহার রাজ-পরিবারের লোকেরা খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গেল। এ ব্যাপারের মধ্যে কি গূঢ় অর্থ নাই? মহম্মদ ও তাহার শিষ্যগণকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য, মক্কাবাসিগণ চেষ্টা করিতে ত্রুটী করে

নাই ; কিন্তু যতই চেষ্টা করে, ততই মহম্মদের শক্তি বাড়িয়া যায়। ইহার মধ্যে কি অর্থ নাই ? অর্থ এই, মানবপ্রকৃতি আসলকে ভালবাসে, যেখানে খাঁটি ঈশ্বরপ্রীতি, খাঁটি নিঃস্বার্থতা দেখিতে পায়, সেখানেই, সেরূপ মানুষের পায়েই, গড়াইয়া পড়ে।

মানব-হৃদয়ের সাধু-ভক্তির বিষয়ে যখনই চিন্তা করি, তখনই অনুভব করি যে, মানব-হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের অনুগত। ঈশ্বর আপনার সন্তানকে আপনার কাছে কাছেই রাখেন।' সাধুভক্তি কখন কখনও অপাত্রে ন্যস্ত হয় বটে, সাধুতার নকল দেখিয়া লোক ভোলে বটে, কিন্তু সে ভোলাতেও প্রকাশ করে, মানব-হৃদয়ের পক্ষে আলসটার কত আকর্ষণ। আসলকে আমরা এতই ভালবাসি যে, তাহার নকল দেখিয়া ভুলিয়া যাই। মানব-হৃদয় ধর্ম্মের এতই অনুগত যে, তাহাকে উত্তমরূপে প্রবঞ্চনা করিতে হইলে, ধর্ম্মের কঞ্চুক পরিতে হয় ; মহীরাবণ যেমন বিভীষণের রূপ ধরিয়া গিয়াছিল, তেমনি ধর্ম্মের বেশ ধরিয়া মানবহৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয়। জগতে মানুষ মানুষকে অনেক-স্থলে ঠকাইয়াছে ও প্রতিদিন ঠকাইতেছে, কিন্তু সকল প্রবঞ্চনার মধ্যে সেই প্রবঞ্চনা সাংঘাতিক, যাহা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের বেশে, ধর্ম্মের আকারে আসে, এবং এরূপ প্রবঞ্চক সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। আসল জিনিষ যাহা, তাহার প্রতি যদি মানুষের প্রাণে প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে তাহার নকল দেখাইয়া মানুষ এতদূর প্রবঞ্চনা করিতে পারিত না। এবিষয়ে এদেশে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। তাহা এই :—

কোনও স্থানে একজন মুসলমান নবাব ছিলেন, তাঁহার এক বিবাহো-পযুক্তা প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিলেন। ঐ কন্যা রূপলাবণ্যের জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন, নবাব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে সাচ্চা ফকির অর্থাৎ প্রকৃত নির্লোভ পুরুষ যদি পান, তবে তাহার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিবেন।

এই মানসে নবাবের রাজ্যের সন্নিকটে কোন ফকীর আসিলেই নবাব তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেন; তাঁহাকে নানাপ্রকার মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন; বিবিধ মূল্যবান খাদ্য বস্তু যোগাইতেন; কিংবা তাঁহাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করিতেন। যদি ফকীর উপহারাদি গ্রহণ করিতেন, বা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য রাজভবনে পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে নবাবের বিশ্বাস জন্মিত যে, ফকীর নির্লোভ পুরুষ নহেন। এইরূপে কত ফকীর আসিল ও গেল; রাজকন্যার বর আর জুটিল না। অবশেষে এক রাজকুমার ঐ কন্যার পাণি-গ্রহণার্থী হইয়া আসিলেন। তিনি নবাবের পূর্ব্বোক্ত পণের কথা জানিতেন না। তিনি সরলভাবে আসিয়াই বলিলেন, "আমি অমুক স্থানের নবাবের পুত্র, আপনার কন্যার রূপগুণের কথা অনেক শুনিয়াছি; তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, নবাব বলিলেন, "সাচ্চা ফকীর না হইলে আমার কন্যা দিব না।" রাজকুমার ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে প্রায় দুই তিন বৎসর পরে নবীন বয়সের এক ফকীর নবাবের রাজধানীর সন্নিকটে দেখা দিলেন। তাহার ফকীরের বেশ, ফকীরের জীবন, কিন্তু দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, মুখে প্রতিভার জ্যোতি, আচার ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত-বংশজাত ব্যক্তির লক্ষণ। এই ফকীর রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছেন এই সংবাদ নবাবসাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রথমে মহামূল্য পরিচ্ছদ ও বিবিধ খাদ্য সামগ্রী উপহার পাঠাইলেন। নবীন ফকীর ঐ সকল দেখিয়া হাস্য করিয়া বলি-লেন, "তোমাদের নবাব কি আমাকে তাহার ধন সম্পদ দেখাইতেন চান? আমি ফকীর মানুষ, আমার এ সকল দ্রব্যে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তাঁহার নিকটে যে সকল লোক বসিয়াছিল, তাহাদিগকে সে সকল দ্রব্য লুটাইয়া দিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে নবাবের মনে বড়ই আনন্দ হইল

ভাবিলেন, আমার কন্যার বর এতদিনে জুটিয়াছে। তৎপরে নবাব ফকীরকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যেরা গিয়া বলিল, "নবাব সাহেবের নিবেদন, আপনাকে দয়া করিয়া একবার রাজভবনে পদার্পণ করিতে হইবে।" ফকীর আবার হাসিয়া বলিলেন, "এত লোক আমার নিকটে আসে, কত ধর্ম্মালাপ হয়, এ সকল ফেলিয়া আমি রাজভবনে যাইব, সে কিরূপ? তোমাদের নবাবের ইচ্ছা হয় তিনি আমার নিকট আসুন।" নবাব এই উত্তর যখন পাইলেন, তখন তাঁহাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। কতিপয় দিবস পরে নবাব উক্ত প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু ফকীর প্রস্তাব শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নবাব সাহেব, আপনার কি স্মরণ হয়, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে অমুক দেশের রাজকুমার আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিয়াছিল?" নবাব বলিলেন হাঁ। ফকীর বলিলেন, "এই যাহাকে ফকীরের বেশে দেখিতেছেন, এ সেই ব্যক্তি। আপনার কন্যাকে পাইবার জন্যই আমি ফকীরের বেশ ধরিয়াছি, নানা তপস্যা করিয়াছি, নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছি, ফকীরের রীতি নীতি শিখিয়াছি, অবশেষে আপনার রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছি। কিন্তু আপনার ভৃত্য চলিয়া যাওয়ার পর, এই কয় দিনে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি ভাবিতেছি, যে জিনিসের নকলের এত আদর, সেই ধর্ম্মের আসল কি তাহা একবার দেখিব; আমি আর আপনার কন্যার পাণিগ্রহণপ্রয়াসী নই; এখন যে নূতন ব্রত আমার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহাই আমি সাধন করিব; এখন আমি স্থানান্তরে চলিলাম।"

নকলের যদি এত আদর, তবে আসল না জানি কি! এ জগতে আসল যাহা তাহাই শক্তি, তাহাই স্থায়ী। মানুষ আপনাকে না জানিয়া

অনেক আশা করে; যাহা নিজের প্রাপ্য নহে, তাহাও পাইতে চায়; কিন্তু চরমে দেখি তাহাতে খাঁটি জিনিস যতটুকু আছে, আসলে সে যতটুকু পাইবার যোগ্য তাহাই লয়। যে মৃত্যুর পূর্ব্বে না পায় সে পরে পায়; বিধাতার রাজ্যে আসল জিনিসের মার নাই! রামমোহন রায় একাকী খাটিলেন, লোকে বলিল, ওটা কোনও কর্ম্মের মানুষ নয়, ওটা অকাল কুষ্মাণ্ড, দেশের শত্রু, মরিয়া গেলে ওর কাজ কর্ম্মের চিহ্নও থাকিবে না। সমকালবর্ত্তী বাঙ্গালিরা বলিল, "বড়লোক যদি দেখিতে চাও, তবে রামদুলাল সরকারকে দেখ, বিশ্বনাথ মতিলালকে দেখ, যাহারা সামান্য অবস্থা হইতে উঠিয়া লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইয়াছে। রামমোহন রায় কিসের বড়লোক? একটু মেধা আছে, একটু মার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, একটু শাস্ত্রীয় বিচারের শক্তি আছে এই মাত্র।" কিন্তু ইতিহাস কি বলিল? রামমোহন রায়ে যে খাঁটী বস্তুটুকু ছিল তাহার আদর দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে। এখন লোকে বলিতেছে, শঙ্করের পরে এমন ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ভারতে জন্মে নাই; এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মানবপ্রেমে এরূপ মহৎলোক, অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেখ আসল বস্তুর আদর হইতেছে কিনা?

অতএব এস, আমরা নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোযোগী হই; বাক্য অপেক্ষা কার্য্যকে শ্রেয় মনে করি; বাহিরের দম্ভ অপেক্ষা ভিতরের শক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করি। কাজে যতটুকু করি ততটুকুকেই আপনাদের প্রকৃত সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। বিষয়ী লোকে কি ছায়া দেখিয়া ভোলে? একজন লোক বিদেশে চাকুরী করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কেহ বলে এক লাখ, কেহ বলে দেড় লাখের কম ত নয়, কেহ বা বলে যতটা শোনা যায় ততটা নয়, পঞ্চাশ হাজারের অধিক হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আনিয়াছে,

সে জানে তাহার সম্পত্তি ত্রিশ হাজার মাত্র। সে কি পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত করে? সে আপন কোমরের জোর কত তাহা জানে, যে কাজই করুক না কেন, ঐ ত্রিশ হাজারকে মনে রাখে, ও তাহার মত কাজই করে। আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে নগদ যতটুকু আছে, ততটুকুই শক্তি, পুষ্পিত বাক্য যতই বলি না, কাজে দাঁড়ায় না। এস আমরা নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোযোগী হই।



সাধুদের সাক্ষ্য।

সকল দেশেই ও সকল যুগেই এমন কতকগুলি মানুষ দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা অপর দশজনকে পরমার্থে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের কথা শুনিয়া লোকে মনে করিয়াছে, কৈ মানুষের মুখে ত সচরাচর এমন কথা শোনা যায় না। সেই পুরাতন তত্ত্ব, সেই পুরাতন কথা, অথচ ইঁহাদের মুখ হইতে সেই কথাগুলি নূতনভাবে ও নূতন শক্তিসম্পন্ন হইয়া বহির্গত হইয়াছে। এই যে প্রাচীনে নূতন ভাব, ইহার এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ, ইহা ইঁহাদের সকলের উক্তিতেই দৃষ্ট হইয়াছে। তাহার ফল স্বরূপ শত শত নরনারীর হৃদয় ইঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে; দলে দলে লোক ইহাদের অনুগমন করিয়াছে। জগতের রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন জাতি সকলকে নানা রাজ্যে ও নানা শাসনতন্ত্রে বিভক্ত দেখা যায়, এক এক দেশ এক এক রাজার শাসনাধীন, সেইরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও মানবকুলের অনেক রাজা দেখিতে পাওয়া যায়, সমগ্র মানব-সমাজ এই বিভিন্ন রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ও লোকে ইঁহাদের শাসনাধীন।

মানব-কুলের এই রাজারা সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ পুরুষ বলিলে অনেক লোকে এই বুঝে যে, তাঁহারা তামাকে সোণা করিতে পারেন, বা অপর কোনও অলৌকিক ও অতিনৈসর্গিক ক্রিয়া করিতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষের অর্থ আমি আর এক প্রকার বুঝিয়া থাকি। যাঁহারা সাধনাগুণে পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধ পুরুষ। সত্যের সাক্ষাৎকার বলিলে কি বুঝায়? তাহা দুইটী দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি। সকলেই ইহা প্রতিদিন দেখিতেছেন দূরে কোনও শব্দ হয়, মানুষ তাহা শুনে। কিরূপে শোনে? শব্দ রহিল

কোথায়, আর মানুষের কর্ণ কোথায়? মধ্যে কতটা ব্যবধান। আমরা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি যে, মানবের কর্ণে পটহের ন্যায় একপ্রকার চর্ম্মময় আবরণ আছে, শব্দ আকাশ বা ইথরের তরঙ্গের দ্বারা নীত হইয়া সেই পটহে আসিয়া আঘাত করে। সেই কম্পন স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহাতেই শ্রুতিজ্ঞান জন্মে। আকাশ বা ইথরের এই তরঙ্গ এতদিন জ্ঞানিগণের অনুমানলব্ধ বিষয় মাত্র ছিল সকলেই বলিতেন, নিশ্চয় কোনও প্রকার তরঙ্গ আছে, নতুবা শব্দজাত কম্পন নীত হয় কি প্রকারে, কিন্তু কেহ সে তরঙ্গ পরীক্ষার দ্বারা দেখেন নাই। ডাক্তার জে, সি, বসু প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা দেখিয়াছেন, পরীক্ষা দ্বারা ঐ তরঙ্গের নিঃসংশয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাড়িতের তরঙ্গ আর তাঁহাদের শোনা কথা নয়, অনুমানলব্ধ জিনিশ নয়, দেখা জিনিস। তুমি আমি আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকলকে যেরূপ উজ্জলভাবে দেখিতেছি, তাঁহারা তেমনি উজ্জলভাবে উহা দেখিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক সত্যের সাক্ষাৎকারের আর এক প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। একবার একটী ইংলণ্ডীয় ধনিসন্তানের একটী বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা এই। একবার একজন ধনিসন্তান পিতৃমাতৃহীন হয়। পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে নিজের জ্যেষ্ঠতাতের হাতে পড়ে। জ্যেষ্ঠতাতটী কৃপণ-স্বভাব বিষয়ী লোক; বিষয় চিন্তাতে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত, সে হৃদয়ের কোমল ভাব সকল বিলুপ্ত প্রায়, সুতরাং সে বালক তাঁহার নিকট স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শন কিছুই পাইত না। জেঠাই মাও ততোধিক। ঐ নারী নিজে যদিও পুত্রহীনা ছিলেন এবং মনে করিলেই এই হতভাগ্য বালককে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বার্থপর ও নির্ম্মম অন্তরে সে প্রীতি ছিল না, তিনি তিক্ত ও কঠোর ব্যবহারে ঐ বালকের হৃদয়কে চির-বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

আর দুই একটী স্ব-সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকও ছিলেন, তাঁহারাও স্বার্থপরতার মূর্ত্তি, নিজেদের খুটিনাটি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, ঐ বালকের প্রতি মনোযোগ করিতেন না। বালকটীকে সকলেই অন্তর্ম্মনা ও চির-বিষণ্ণ দেখিতে পাইত। সে কাহারও নিকট মন খুলিত না। যে দুই এক জনের নিকট মন খুলিত, তাহাদের সহিত নারী প্রকৃতি লইয়া বিবাদ হইত। সে নারী-দ্বেষী হইয়াছিল। সে বলিত, নারী-প্রকৃতির প্রশংসা যে লোকে এত করে সে সমুদয় কল্পিত কথা। প্রণয় বলিয়া যে একটা কিছু আছে, তাহা নহে ও সমুদয় কেবল স্বার্থের খেলা, নর-নারীর নিকৃষ্ট প্রকৃতির প্রণোদিত কার্য্য। স্বার্থের জন্যই, আত্ম-সুখের জন্যই মানুষ পরস্পরকে আশ্রয় করে। পবিত্র প্রেম, অকপট প্রণয়, বলিয়া যে একটা কিছু আছে, বন্ধুগণ তাহাকে তাহা বুঝাইতে পারিত না। ক্রমে সেই বালক যুবক হইল। একবার সে কোনও কার্য্যানুরোধে কোনও সহরে গিয়াছিল। সেখানে একজন দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকের ভবনে তাহাকে কয়েকদিন বাস করিতে হয়। ঐ গৃহস্থের একটী কন্যা ছিল। সেই কন্যাটীর সহিত পরিচিত হইয়া যুবক যেন হঠাৎ আর এক জগৎ দেখিতে পাইল। এমন মধুরতা, এমন লজ্জাশীলতা, চিত্তের উদারতা ও সুকোমলতা সে পূর্ব্বে নারীচরিত্রে দেখে নাই। দেখিয়া তাহার মন নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। নারীজাতির প্রতি তাহার যে ঘৃণা ছিল, কোথা দিয়া যে অন্তর্হিত হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে ঐ মহিলার সাধুতা ও পবিত্রচিত্ততার অনুধ্যান করিতে করিতে স্বীয় ভবনে প্রতি-নিবৃত্ত হইল। তৎপরে দেখা গেল, সে অবসর পাইলেই সেই সহরে সেই পরিবারে যাইতেছে। কিছু দিনের মধ্যেই এই সংবাদ জ্যেষ্ঠতাতের গোচর হইল। বাড়ীর মহিলারা বলিলেন, সে প্রেমের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি পাউণ্ড,

শিলিং, পেন্স বোঝেন, প্রেমের বিষয় কিছু বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"রস না, ওকে দেশভ্রমণের জন্য পাঠাইতেছি, তাহা হইলেই ওর নেশা ছাড়িয়া যাইবে।" এই বলিয়া কৌশলে তাহাকে দেশ ভ্রমণের জন্য পাঠাইলেন। যুবক দেশ ভ্রমণ করিতে গেল; কিন্তু দিক্-দর্শন যন্ত্রের কাঁটা যেমন উত্তর দিকেই ফিরিয়া থাকে, তেমনি তাহার মন ঐ বালিকার দিকে ফিরিয়াই রহিল। বহুদিন পরে বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আবার সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। তখন জ্যেষ্ঠতাত বিপদ গণনা করিতে লাগিলেন এবং কল কৌশল পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎভাবে নিষেধ আরম্ভ করিলেন, "তুমি ওখানে যাইতে পারিবে না। আমাদের মত অবস্থার লোকের এরূপ হীনাবস্থ ব্যক্তি-দিগের সহিত বন্ধুতা ভাল নয়; ও বালিকাকে তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না; ও তোমার উপযুক্ত স্ত্রী কখনই নহে।" এই বিষয় লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের সহিত যুবকের বিরোধ উপস্থিত হইল; তিনি ক্রোধ করিয়া তাহার সমুদয় পৈত্রিক বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং নিজ ভবন পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। যুবক গৃহ-তাড়িত হইয়া সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তখন একজন বন্ধু এক দিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ভাই, এই না তুমি বলিতে প্রণয় বলিয়া একটা কিছু নাই, নর-নারী পরস্পরকে স্বার্থের জন্যই আশ্রয় করে। এখন কি বল? প্রণয় বলিয়া একটা কিছু আছে কিনা?" তখন ঐ যুবক সলজ্জভাবে বলিল, "আগে আমি অন্ধ ছিলাম; এখন দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

পূর্ব্বোক্ত দুইটী দৃষ্টান্তে সকলে পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎকারের অর্থ কি বুঝিলেন? পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎকার দুই প্রকারে হয়। প্রথম, সাধনার দ্বারা কোনও সত্যে নিঃসংশয়িতরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা, দ্বিতীয়

কোনও নূতন শক্তির দ্বারা নিজের অধিকৃত হইয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া। এ ভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলকে সাক্ষাৎকার না করিলে, তাহা আমাদের নিকট মৃত হইয়া থাকে। সাধুমুখে কত কথাই শুনিতে পাই, শাস্ত্রে কত কথাই দেখিতে পাই, সে সমুদয় শোনা কথা মাত্র। যত দিন তাহার প্রমাণ নিজের মধ্যে না পাওয়া যায়, ততদিন তাহা নিজস্ব নহে। তুমি যে অপরকে বল,—"দয়াল নামে তরে যাবে", তুমি কি দয়াল নামে তরিয়াছ? তুমি কি নিজ অন্তরে দয়াল নামের শক্তি দেখিয়াছ? তুমি কি সেই ধনিসন্তানের ন্যায় বলিতে পার "আগে অন্ধ ছিলাম, ঈশ্বর যে আছেন, তাহার প্রমাণ এখন নিজ হৃদয়েই দেখিতেছি, তাঁহার দ্বারা অধিকৃত হইয়া বুঝিতেছি।" এরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের প্রমাণ পাইবার জন্য কত লোক ব্যগ্র হন? জগতের অধিকাংশ লোকেই গতানুগতিকের অনুসরণ করিতেছে; অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রচারক তোতা পাখীর ন্যায় শোনা কথা বলিতেছে। কতিপয় অসাধারণ-প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষ এখানে জন্মিয়াছেন, যাঁহারা গতানুগতিকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ইঁহারাই জগতের মহাজন। ইঁহারা এক এক জন এক এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বুদ্ধ শান্তভাবে সিদ্ধ, মহম্মদ দাস্যভাবে সিদ্ধ, পারস্য কবি হাফেজ সখ্যভাবে সিদ্ধ, যীশু বাৎসল্যভাবে সিদ্ধ, চৈতন্য মধুরভাবে সিদ্ধ। বাৎসল্যভাব দুই প্রকারে হইতে পারে; ঈশ্বর পিতা আমি সন্তান, এই একভাব, আর আমি পিতা বা মাতা ও ঈশ্বর সন্তান, এই আর এক ভাব। দ্বিতীয়োক্ত ভাবটী মীরাবাই প্রভৃতি এ দেশের বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে অনেকে সাধন করিয়াছেন, কিন্তু যীশু প্রভৃতি পিতৃভাবেই সিদ্ধ।

এই সকল মহাজনের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ইঁহারা গতানুগতিকে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-

ছিলেন যে, নিজেরা একবার তলাইয়া দেখিবেন সত্যের ভূমি কিছু পাওয়া যায় কিনা ; এবং জীবন মরণ পণ করিয়া এই ব্রতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ব্যাকুলতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার বিষয়ে চিন্তা করিলে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। বুদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যে আমার শরীরের অঙ্গ সকল খসিয়া পড়ুক, কীটে এ দেহকে ক্ষত বিক্ষত করুক, তথাপি আমি এই বোধিদ্রুমের তল হইতে উঠিব না ; আলোক পাইতেই হইবে"। যীশু মানসিক যাতনাতে অভিভূত হইয়া চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত্রি, অরণ্য মধ্যে অনাহারে পড়িয়া রহিলেন, সত্যের সাক্ষাৎকার না হইলে উঠিব না। মহম্মদ হরা পার্ব্বতের গহ্বরে পড়িয়া চিন্তা করিতে করিতে এমনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, যে বলিলেন, "সত্যের আলোক না পাইলে এ প্রাণ রাখিব না," এই বলিয়া গিরিপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। চৈতন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে—"কৃষ্ণ রে বাপ রে! দেখা দে রে" বলিয়া কাঁদিয়া গয়াতীর্থের পথে বাহির হইয়াছিলেন ; এবং নবদ্বীপেও সময়ে সময়ে মাটিতে পড়িয়া এরূপ মুখ ঘসিতেন যে মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইত। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য এরূপ ব্যাকুলতা কি সাধারণ মানুষের হয়? এই স্থানেই ইঁহাদের অসাধারণত্ব। লোকে যে সকল চিরপ্রচলিত মত ও ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট ছিল, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া ইঁহারা চিন্তাসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং অতলে ডুবিয়া মহামূল্য সত্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। সিসিলি দ্বীপস্থ প্রাচীন সাইরেকিউজ নগরে আর্কিমিদিস নামে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন ; তাঁহার বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি একবার একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যার মীমাংসার জন্য কয়েকদিন চিন্তিত ছিলেন। এক দিন স্নানাগারে স্নান করিতে গিয়া জলের টবের মধ্যে বসিবামাত্র ঐ মীমাংসাটী তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইল। তখন সেই তত্ত্ব অনুভব

করিয়া, তাঁহার মনে এতটা আনন্দ ও এতটা আবেগ হইয়াছিল যে তিনি "পেয়েছি, পেয়েছি' ব'লিয়া, নগ্নদেহে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল মহাজনও কি একটা দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া জগতে বা হর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুদ্ধ নিরঞ্জন নদীর তীরে বহুকাল তপস্যায় যাপন করিলেন, কিন্তু যেদিন সিদ্ধিলাভ করিলেন, সেদিন বারাণসীতে পঞ্চ শিষ্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন্; তোমরা শোন আমি নূতন আলোক পাইয়াছি।" পথে যে তাহার সংস্রবে আসে, সেই পরিবর্ত্তিত হয়। যীশু চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি একান্তে যাপন করিয়া যেদিন সিদ্ধিলাভ করিলেন, সে দিন মহোৎসাহে ফিরিয়া আসিলেন,—বলিলেন,—"হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকসকল আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব"। যাহাকে ধরেন, সেই বদলিয়া যায়। দুইজন ধীবর ভ্রাতা এক স্থানে থাকিত, যীশু তাহাদের ভবনে একরাত্রি বাস করিলেন, তাহাদের কাণে কি মন্ত্র দিলেন, পরদিন তাহারা উভয়ে জাল ফেলিয়া রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে যে দিন সিদ্ধি লাভ করিলেন, সে দিন আর পর্ব্বতকন্দরে থাকিতে পারিলেন না। মহোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, মক্কাবাসিগণ শ্রবণ কর, "লা এল্লা ইল্লালাহা—একমাত্র সত্য ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই,—লা সরিক, তাহার অংশী নাই"। যে তাহার সংশ্রবে আসে সেই বদলিয়া যায়।

একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি ইহারা কি নূতন তত্ত্ব আবিস্কার করিলেন, এবং কিসের গুণে এত মানুষ বদলিয়া গেল। ভিতরকার কথাটা একই,—যাহা তুমি আমি আজও বলিতেছি। বুদ্ধ বলিলেন—"মানবের কার্য্যের উপরে মহাধর্ম্ম নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে সত্য বলিয়া জান, ও বাসনাবিলয় করিয়া তাহার অধীন হও।" যীশু বলিলেন,

"ঈশ্বর তোমাদের পিতা, এ রাজ্য তাঁহারি রাজ্য, তোমরা সমগ্র মন, সমগ্র হৃদয় ও সমগ্র শক্তির সহিত তাঁহাকে প্রীতি কর ও তাঁহার ইচ্ছাতে আত্ম-সমর্পণ কর।" মহম্মদ বলিলেন—"মহান্ প্রভু পরমেশ্বর, জগত তাঁহারই রাজ্য, তোমরা সম্পূর্ণরূপে তাহার আজ্ঞাধীন হও।" কথাটা কি একই নয়? সকলেরই উক্তির মধ্যে দুইটি সার কথা পাওয়া যাইতেছে; প্রথম কথা এই, এ জগতে মানুষ কর্ত্তা নহে, তাহার উপরে আর এক শক্তি আছে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডকে ও মানবের ভাগ্যকে নিয়মিত করিতেছে; দ্বিতীয় কথা এই, প্রবৃত্তি-কুলকে সংযত করিয়া, আত্ম-বিলোপ করিয়া, সেই শক্তির অনুগত হওয়াই মানবের পক্ষে সদ্গতি। দেখিতেছি ইন্দ্রিয়াতীত শাসন-শক্তিতে বিশ্বাস ও প্রবৃত্তিকুলকে সেই শাসনের অনুগত করা, এই দুইটিই নকল সম্প্রদায়ের সকল সাধুর সাধনের ভিতরকার কথা। ইহা মানব-প্রকৃতির একটা গূঢ় রহস্য যে, যাহারা মানবকে যথেচ্ছাচার করিতে বলিয়াছে, প্রবৃত্তিকুলের অনিয়ত চরিতার্থতার উপদেশ দিয়াছে, তাহারা মানবের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতে পারে নাই; কিন্তু যাঁহারা মানবকে আত্ম-সংযমের উপদেশ দিয়াছেন,—বলিয়াছেন "উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলকে বাধ্য ও ধর্ম্মশাসনের অনুগত কর," তাহারাই হিতৈষী বন্ধু ও আচার্য্য, উপদেষ্টা বা গুরুরূপে গৃহীত হইয়াছেন। সর্ব্বদা দেখি স্বাধীনতা জীবের প্রিয়। পক্ষীটি আপনার মনে বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে, হঠাৎ তাহাকে ধর, বন্দী কর, স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে সে নিজের পদ-দ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তথাপি সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবে না। শিশুটি আপনার মনে খেলিতেছে, তাহার হস্ত দুখানি ধর, তাহার স্বাধীনতাতে বাধা দেও দেখিবে, কিয়ৎক্ষণ পরেই সে কাঁদিয়া উঠিবে। জীব স্বাধীনতা চায়। কেন তবে "প্রবৃত্তিকুলকে সংযত কর" সাধুদের মুখে এ উপদেশ শুনিতে ভাল লাগে?—কেন এই এক বিষয়ে ও এক স্থানে আমরা

আনুগত্য ও দাসত্বকে এত স্পৃহণীয় মনে করি? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, ঈশ্বর আমাদের আত্মাতেই সন্নিহিত রহিয়াছেন! আমাদের স্বরূপের সহিত তাহার স্বরূপ মিশ্রিত বলিয়াই আমাদের উর্দ্ধদিকে গতি, সংযমের প্রতি আমাদের এত নিষ্ঠা।

আমাদের হৃদয়ের উপরে সাধু মহাজনগণের এত প্রভাব তাহারও মূল এইখানে। আমাদের প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক পারমার্থিকতা আছে, তাঁহারা তাহারই মুখপাত্র। এই জন্য তাঁহাদের এত আদর। আমরা সর্ব্বোচ্চ অবস্থাতে হৃদয়ে যে সর্ব্বোচ্চ ভাব ধারণ করি, তাঁহাদের মধ্যে তাহাই প্রতিফলিত দেখি, এই জন্য আমাদের চিত্তের উপরে তাঁহাদের এতটা শক্তি। তুমি যদি আমাকে ক্ষুদ্র কথা বল, ক্ষুদ্র আদর্শ দেখাও, ক্ষুদ্রে আসক্ত কর, তুমি আমারই মত একজন দুর্ব্বল মানুষ,—তোমার বন্ধুতা না থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত; যাহারা আমার চিত্তকে ক্ষুদ্র বিষয় হইতে তুলিয়া মহৎ বিষয়ের অনুধ্যানে নিযুক্ত করেন, আমাকে প্রবৃত্তিকুলের উপরে জয়শালী করিয়া প্রকৃত স্বাধীন জীব করিতে চান, তাঁহারাই আমার হৃদয়ের রাজা, আমার মন সহজেই তাঁহাদের চরণে অবনত হয়। এই জন্য মানবহৃদয়ের উপরে মহাজনদিগের এত প্রভাব, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমরা মানবজীবনের মহত্বকে হৃদয়ে ধারণ করি, ও আমাদের উচ্চপ্রকৃতিকে খুঁজিয়া পাই। এই মহৎকার্য্য যাহারা সম্পাদন করেন, তাঁহারা কি জগতের, মহোপকারী বন্ধু নহেন?

মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল।

পাঠকদিগের মধ্যে বোধ হয় এমন একজনও লোক নাই, যাঁহাকে সময়ে সময়ে নিজের দুর্ব্বলতায় নিজে লজ্জিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে হয় নাই। জীবন-সংগ্রামে আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছি, যেন কোন অলক্ষিত শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমাদের সাধু সংকল্পসকলকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে, আমাদের প্রতিদিনের শত শত প্রতিজ্ঞাকে চূর্ণ করিতেছে, আমাদিগকে কেশাকর্ষণ করিয়া রিপুকুলের পদতলে লুণ্ঠিত করিতেছে। যাঁহাদের সদসৎ জ্ঞান আছে, ধর্ম্মভয় আছে, অসৎবিষয় পরিহার পূর্ব্বক সৎবিষয় অবলম্বনে প্রবৃত্তি আছে, আধ্যাত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহাদের পক্ষে এ অবস্থার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আর কি হইতে পারে? এইরূপে নির্জ্জনে কত লোকের চক্ষে অনুতাপের অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? নরকুলে তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্, তাঁহারাই সুখী, যাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না, যাঁহাদের বাসনা ও শক্তির সাম্য আছে এবং যাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বাহিরের জীবনে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সাধুদিগের জীবন আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহারা যখন নির্জ্জনে বসিয়া আত্ম-চিন্তায় রত হইতেন এবং তাঁহাদের নেত্রপ্রান্ত দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইত, সে সময়কার ভাবের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা কি অনুভব করি? কোন্ মনস্তাপে তাঁহাদিগকে ম্লান করিত? কোন্ গূঢ় মানসিক ব্যাধি তাঁহাদিগকে অশ্রুজলে ভাসাইত? চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির অসামঞ্জস্যই ঐ অনুতাপ ও অশ্রুর

কারণ। তাঁহারা জীবন-সংগ্রামে যখন দেখিতেন যে, তাঁহাদের শক্তি তাঁহাদের ইচ্ছার অনুরূপ নয়, তখনই তাঁহাদের হৃদয় গভীর শোকে আকুল হইত; তখনই তাঁহারা মনের ক্ষোভে মস্তকের কেশ ছিন্ন করিয়া ও পৃথিবীর ধূলিতে সেই মস্তক পূর্ণ করিয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। এইরূপে জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া আমাদের অনেককেই অনেক সময়ে পরিতাপিত হইতে হয়। সাধ করিয়া ঘরখানি বাধিলাম, হঠাৎ দুরন্ত ঝটিকা উত্থিত হইয়া আমার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল, তাহার মালমসলা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রহিল। সেই বিক্ষিপ্ত মালমসলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেমন দুঃখের সঞ্চার হয়, সেইরূপ আমরা অনেক কষ্টে যে চরিত্রের ঘর বাঁধি, তাহাও যখন প্রবৃত্তি বা প্রলোভনের আঘাতে ভগ্ন হইয়া যায় এবং তাহার মালমসলাগুলি হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া থাকে, তখন সেইগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নির্জ্জনে অনেক অশ্রুপাত করিতে হয়। এইরূপে ভগ্ন চরিত্রের বিক্ষিপ্ত উপকরণ সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুণ্ণ হন নাই, এরূপ লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিজ্ঞার বলের অভাবে নিজ নিজ চরিত্রে যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই জানি এবং তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় শোকসন্তপ্ত হয়; সুতরাং সেই চরিত্রের বলের বৃদ্ধির উপায় কি, এ প্রশ্নের মীমাংসায় সকলেরই মনোযোগ হইবে।

কিন্তু মানবচরিত্রে প্রতিজ্ঞার বলের প্রয়োজন কত, তাহা জানিবার পূর্ব্বে মানবচরিত্র কি তাহা জানা আবশ্যক। অতএব অগ্রে সেই বিষয়েরই কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আমরা আজি পর্য্যন্ত চরিত্রের তিনটী লক্ষণ শুনিয়াছি। প্রথমটী এই,—কোন ব্যক্তির সহিত মিশিয়া ও তাহাকে বার বার দেখিয়া তাহার চক্ষু মুখ নাসিকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের যেমন একটী সাধারণ সংস্কার (general

idea) হয়, যাহাকে চলিত ভাষায় "আকৃতি" বলে, সেইরূপ লোকের সহিত মিশিয়া ও তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া তাহার হৃদয় মনের দোষগুণ সম্বন্ধে আমাদের একটী সাধারণ সংস্কার জন্মে, যাহাকে তাহার হৃদয় মনের চেহারা বলা যাইতে পারে, ইহাই তাহার চরিত্র। কোন বিদেশ গত বন্ধুর কথা মনে করিয়া তাঁহাকে স্মৃতিপথে আনিবামাত্র তাঁহার বাহিরের শরীরের একটী আকৃতি মনের মধ্যে অঙ্কিত হইবে। অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব মনে আসিবে না; কিন্তু সমুদায় সম্বলিত ও সকলের সমষ্টিভূত একটী স্থূল ভাব আসিবে; তাহাই তাঁহার শরীরের চেহারা বা আকৃতি। সেইরূপ কোন দূরস্থিত বন্ধুর নাম উল্লেখ করিলে, তাঁহার হৃদয় মনের যে ছবি মনে অঙ্কিত হয়, তাহা তাঁহার চরিত্র। সেই ছবি তাঁহার হৃদয় মনের গুণাবলির সমষ্টি-সম্ভূত।

দ্বিতীয় লক্ষণ :—মানবপ্রকৃতির অব্যক্ত গূঢ় শক্তিই চরিত্র। এই লক্ষণটী কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রথমে লোকের বিদ্যা বা ব্যুৎপত্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক। বিদ্যা বা ব্যুৎপত্তি কাহাকে বলে? মনে করুন একজন সুশিক্ষিত এবং বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি অল্পবয়স্ক শিশুদিগের শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার যতটুকু বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, সেইটুকুই কি তাঁহার বিদ্যা? তাহা নহে। সেই কার্য্যের পশ্চাতে যে অব্যক্ত গূঢ় শক্তি রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে তিনি সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে পারিতেছেন এবং আবশ্যক হইলে আরও এরূপ অনেক শিক্ষা দিতে পারিবেন, সেই অব্যক্ত গূঢ় শক্তিই তাঁহার বিদ্যা বা ব্যুৎপত্তি। একটী জাতির বিষয় চিন্তা করা যাউক; এই যে ইংরাজেরা এ দেশ শাসন করিতেছেন, এই শাসনকার্য্যে তাঁহাদের যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, আমরা তাঁহাদের অনেক বিদ্যা, বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয়

পাইতেছি; কিন্তু কেবল সেইটুকুই কি ইংলণ্ডের মহত্ব? তাহা নহে। এ বিদ্যা বুদ্ধি ও দক্ষতার পশ্চাতে, যে অব্যক্ত বহুদূর প্রসারিত বিদ্যা ও দক্ষতা রহিয়াছে, যাহার গুণে সুশাসন করা সম্ভব হইয়াছে এবং যাহার প্রভাবে তাঁহাদের শত শত ব্যক্তিকে আজি হত্যা করিলে, তখনই অপর শত শত ব্যক্তি সেই স্থান অধিকার করিতে পারিবে, সেই গূঢ় শক্তি বা অব্যক্ত মানসিক বলবীর্য্যই ইংলণ্ডের মহত্ব। অর্থাৎ, ভাবুন সেই দেশ কিরূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন, যে দেশের প্রথম শ্রেণীর লোক গ্লাডষ্টোন্ প্রভৃতি এ দেশে আসিবার চিন্তাও কখনও করেন না, যে দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ফসেট্ প্রভৃতি, এ দেশে আসা আবশ্যক ভাবেন না, যে দেশের তৃতীয় শ্রেণীর লোক গ্রাণ্ঠ ডফ্ প্রভৃতি উন্নত পদলাভ করিয়া কচিৎ এ দেশে আগমন করেন; সুতরাং সে দেশের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর লোকের দ্বারাই এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য শাসিত ও সুরক্ষিত হইতেছে। অতএব ইংলণ্ডের যে বল আপনারা দেখিতেছেন তাহাতেই ইংলণ্ডের মহত্ব নয়; কিন্তু যাহা দেখিতেছেন না, তাহাতেই মহত্ব নিহিত রহিয়াছে। চরিত্র সম্বন্ধেও এইরূপ। কথা ও কাজে লোকের যতটুকু সাধুতার পরিচয় পাইতেছি, তাহার পশ্চাতে যে অব্যক্ত ও গভীর কূপ-সমান সাধুতার উৎস রহিয়াছে, যাহা হইতে ঐ কথা ও কাজ উৎপন্ন হইয়াছে ও আবশ্যক হইলে ঐরূপ শত শত কথা ও কাজ উৎপন্ন হইবে, মানব-প্রকৃতির সেই গূঢ় শক্তিই চরিত্র।

ইতিহাসে আজ যাঁহাদের নাম উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, যাঁহারা মুখের এক একটী কথাতে কত কত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাদের অঙ্গুলির এক একটি সঙ্কেতে এক একটি জাতি মোহশয্যা হইতে উত্থিত হইয়াছে, সেই সকল মহাজনের কথা যদি স্মরণ করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? কিসের গুণে তাঁহাদের এত প্রভাব? কি জন্য

তাঁহাদের এত আকর্ষণ? কেবল কি মুখের কথাতে? সেরূপ কথা এবং তদপেক্ষা উচ্চ উচ্চ কথাতো তুমি আমি প্রতিনিয়ত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতেছি, কই কয়জন আকৃষ্ট হইল? কয়জন জাগিল? কয়জনের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল? মানুষ যে কথা বলে তদ্দ্বারা কাজ হয় না, কিন্তু যাহা বলিতে বাকি রাখে, তদ্দ্বারাই কাজ হয়। অর্থাৎ সেই কথার পশ্চাতে যদি এমন কোন অব্যক্ত সাধুতা না থাকে, যাহার ছায়া সেই কথার উপর পড়িয়া কথাকে সুন্দর করে, যাহা হইতে সেই কথাও তদনুরূপ কত কথা উৎপন্ন করে, তবে সে কথাকে গলিত পত্রের ন্যায় লোকে উপেক্ষা করে। জগতের মহাজনদিগের কথাতে যে লোকে আকৃষ্ট হইত, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া কাছে বসিয়া ও আলাপ করিয়া তাহারা অগ্রে দেখিত যে, তাঁহাদের অন্তরে অগাধ সাধুতার খনি, তৎপরে সেই সাধুতার ছায়া পড়াতেই এক একটি কথা জীবন্ত বীজের ন্যায় জীবন উৎপন্ন করিত। এই গূঢ় জীবনপ্রদ শক্তি, এই অব্যক্ত সাধুতা, এই হৃদয়নিহিত সাধুতার উৎস—ইহাই চরিত্র, ইহা মানবপ্রকৃতিসঞ্চিত বল (Reserve force)।

চরিত্রের তৃতীয় লক্ষণ এই:—মানব যেরূপ ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা আপনাকে চালিত করে ও যদ্দ্বারা আপনাকে শাসিত করে, সেই ধর্ম্ম-নিয়ম ও সেই আত্মশাসন শক্তিই চরিত্র। এই অর্থে চরিত্র মানবের আয়ত্তাধীন ও আত্মশাসন শক্তি এবং প্রতিজ্ঞতার বল সম্ভূত। এই চরিত্র গঠন সম্বন্ধে মানবমনের সম্পূর্ণ আধিপত্য।

এখন বিবেচনা করা যাউক কি কি উপাদানে এই চরিত্র গঠিত হয়। সমুদায় চরিত্রবান্ ব্যক্তির মানসিক দুইটা গুণাবলির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের চরিত্রের মূলে প্রধানতঃ দুটী উপাদান দৃষ্ট হইবে।

প্রথম উপাদান, ধর্ম্মনিয়মে বিশ্বাস। ধর্ম্মের নিয়ম সকলে অবিচলিত

আস্থা ভিন্ন কেহই অদ্যাপি চরিত্রবান্ লোক হইতে পারেন নাই; এই সংসারের প্রতিকূল স্রোত-সকলের মধ্যে কাহার সাধ্য মানবকে সুস্থির রাখে? আমাদের পদতলের মৃত্তিকা যেন নিরন্তর কালস্রোতে নীত হইয়া সরিয়া যাইতেছে; দাঁড়াইব কি, প্রবল স্রোত আসিয়া আঘাত করিতেছে। প্রলোভন সকল নানা দিকে আকর্ষণ করিতেছে; ধর্ম্মের সূক্ষ্ম নিয়ম সকল একবার দেখিতে পাইতেছি আবার প্রবৃত্তির কলুষিত জলের মধ্যে হারাইয়া ফেলিতেছি। এই চঞ্চল, অস্থির, প্রতিকূল ঘটনা-বলির মধ্যে আমাদিগকে সুস্থির রাখে কে? দেখিতে পাই যাহারা বিশ্বাস চক্ষে সেই সূক্ষ্ম নিয়মগুলি লক্ষ্য করিয়া তদুপরি অটলভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তাঁহারাই কথঞ্চিৎ সুস্থির থাকিতে পারেন। বিশেষ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ভিন্ন সে ধর্ম্ম নিয়মগুলি অবলম্বন করা যায় না। এক ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দেখিবে যে, চারিদিকে অধর্ম্মের জয় হইতেছে, অধর্ম্মা-চরণের দ্বারা লোকে সুখ-সমৃদ্ধি সঞ্চয় করিতেছে, পদে পদে ধর্ম্মনিয়ম সকল লঙ্ঘন করিতেছে, অথচ সে ব্যক্তি ধর্ম্মকে সার ভাবিয়া সেই পথ অবলম্বন করিবে, এ কি সাধারণ বিশ্বাসের কথা! এইরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ভিন্ন অদ্যাপি কেহ মানবকুলে শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশে এক প্রকার পিপীলিকা আছে তাহাদের অধ্যবসায় এত দৃঢ় যে, তাহারা যদি কোন বস্তুকে দংশন করে, আর যদি তুমি তাহাদের শরীর ধরিয়া টানাটানি কর, শরীরটি মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবে কিন্তু তথাপি তাহারা দংশন শিথিল করিবে না। জগতের চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণও সেইরূপ প্রাণপণে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে যদি হত্যা কর, তাঁহারা মরিতে মরিতেও তাঁহাদের অবলম্বিত সত্যগুলিকে ধরিয়া থাকিবেন। ইতিহাসে এরূপ বিশ্বাসবান্ ব্যক্তির অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ড সাহেব অতি দরিদ্র লোকের সন্তান ছিলেন। তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে যখন সামান্য কার্য্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার মানসে স্বগৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণা মাতা তাঁহাকে একটি কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। (Dare to do the right, my boy) "বাছা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে ভয় পাইওনা"। কি আশ্চর্য্য উপদেশই সেই দরিদ্রের পত্নীর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল! গারফিল্ড নিজে বলিয়াছেন, মায়ের এই অমূল্য উপদেশ অবিনশ্বর অক্ষরে তাঁহার হৃদয়পটে চিরদিন অঙ্কিত ছিল। ইহারই জন্য তিনি সাধুতাচরণে কখনও ভীত হইতেন না। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত ও উচ্চপদস্থ হইয়া যখন তাঁহাকে কার্য্য-কালে লোকের প্রতিকূলতা ও আপত্তি পদে পদে সহ্য করিতে হইত, তখন তিনি জননীর পূর্ব্বের কথাগুলি স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিতেন। ধর্ম্ম নিয়মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে মানবের মনুষ্যত্বই হয় না।

দ্বিতীয় উপাদান, আত্মশাসন। আপানকে যিনি স্বীয় শাসনে রাখিতে অসমর্থ তাঁহার চরিত্র অদ্যাপি গঠিত হয় নাই। জগতের চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ এই গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেবল বিশ্বাস দ্বারা ধর্ম্ম-নিয়ম সকলকে দেখিলেই হইবে না, আপনাকে সেই সকল ধর্ম্ম-নিয়মের অনুগত করিতে পারাই মহত্ব। মানুষ যখন আপনার চিত্তকে আপনি শাসন করিয়া আপনাকে ধর্ম্ম নিয়মের অনুগত করে, তদপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আর কিছুই নাই। আপনাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন করিবার চেষ্টাতেই মানুষের হৃদয় মনকে মহৎ করে। কারণ স্বার্থপরতা ও সুখশক্তিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে মানুষ প্রকৃতরূপে কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে পারে না।

মহামনা চরিত্রবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই আত্মশাসন-শক্তি দেখিতে পাওয়া

যায়। তাঁহারা প্রবৃত্তির অধীন নন, কিন্তু প্রবৃত্তি সকলই তাঁহাদের অধীন। তাঁহারা স্বেচ্ছামতে স্বীয় স্বীয় মনকে যথেচ্ছপথে নিয়োগ করিয়া থাকেন। মনেরও অভ্যাস ও শিক্ষা এইরূপ যে, সে অন্যপথে যায় না! ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজেবেথের চ্যান্সেলর লর্ড বর্লের বিষয় এইরূপ উক্তি আছে যে, তিনি কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার রাজকীয় পোষাক উন্মোচন করিয়া রাখিবার সময় বলিতেন, "Lie there Lord Chancellor" "অর্থাৎ লর্ড চ্যানসেলর, ওইখানে থাক," ইহার পর যখন তিনি স্বীয় পরিবার মধ্যে পারিবারিক সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন আর রাজ্যের চিন্তা তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিত না। মনস্বী লোকের চিহ্ন এই যে, তাঁহারা একটি চিন্তাকে বলিলেন, দশদিন বিলম্ব কর, অমনি সে চিন্তাটি দশদিন আর মাথা তুলিবে না। নিজের হৃদয় মনের উপর যাঁহার এ প্রকার শক্তি আছে, তিনিই বীর, তিনিই স্বাধীন ; এইরূপ লোকেই জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞার বল বৃদ্ধি করিবারও তিনটী উপায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সামান্য সামান্য বিষয়েই দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অধীন হইয়া কার্য্য করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই সত্যের অনুসারে চলিবার চেষ্টা করা। কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে হইলে সুখ বা স্বার্থের দিকে দৃষ্টি করিলে চলিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে ভাবিবে, লোকভয় যদি গণ্য করি, স্বার্থনাশে যদি কাতর হই, বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যদি ক্ষুন্ন হই, সাংসারিক অসুবিধার দিকে যদি বার বার চাহিয়া দেখি, তবে মানুষ হইতে পারিব না। মনকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিয়া একবার যদি কর্ত্তব্য কার্য্য করাইয়া লইতে পারি তবেই পথ পরিষ্কার হইল।

সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল পণ্ডিত জেম্‌স্ মার্টিনো বলিয়াছেন, মানবের কর্ত্তব্য-পথ যেন কুয়াশাতে আচ্ছন্ন; সাহস করিয়া অগ্রসর হও, এখন যে স্থান ঘন নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, সেখানে তোমার দৃষ্টি চলিবে; আবার পশ্চাতে সরিয়া পড়, এখন যাহা পরিষ্কার দেখিতেছ, তাহাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

বুদ্ধির অনুগত হইতে গেলেই চিত্ত-সংযমের অভ্যাস করিতে হইবে। একটী স্থলে কৃতকার্য্য হইলে আরও দশটী স্থলে আশা ও সাহস বৃদ্ধি পাইবে। মানুষের প্রকৃতি এই যে, মানুষ যে পরিমাণে আপনার গূঢ় শক্তির পরিচয় পায়, সেই পরিমাণে তাহার উৎসাহ ও আশা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শিশু প্রথম যে দিন দুই পা চলিতে পারিল সেদিন তাহার জীবনের এক প্রধান দিন। সে আপনার শক্তি দেখিয়া আপনি বিস্মিত হয়। তৎপরে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। সেইরূপ যে বালক কঠোর শাসনে রক্ষিত, যে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করিতে পায় না, এবং পিতা যাহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করেন, সে যদি দৈবাৎ ভার-প্রাপ্ত হইয়া কোন একটী বুদ্ধির কাজ করিতে পায়, অমনি তাহার উৎসাহ দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। লোকসমাজে বক্তৃতা করিবার নামে যিনি কম্পিত হন, তিনি যদি একদিন ভাল বলিতে পারিলেন, অমনি তাঁহার জীবনের উন্নতির আর একটী দ্বার খুলিয়া গেল। সেইরূপ একটী স্থলে আপনাকে কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন করিতে পারিলে, লোকের সাহস ও সৎপ্রবৃত্তি দশগুণ বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয় উপায়, চরিত্রবান্ লোকদিগের জীবনচরিত পাঠ করা। সাধুমনা ও মনস্বী লোকদিগের জীবন-চরিত পাঠের উপকার অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, এক এক জন মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করিতে করিতে আমাদের দুর্ব্বল

প্রকৃতিকে যেন জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে, আমাদের অন্তরে সাহস ও বল বাড়াইয়াছে, আমাদের প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ় করিয়াছে এবং আমাদের বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে। আমার একজন বন্ধু একদিন আমাকে বলিলেন, রেনানের লিখিত খ্রীষ্টের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত কয়েক মাস যেন আশ্চর্য্য ভাবের তরঙ্গে ভাসিতেছিল। যদি কেহ নিজ চরিত্র গঠন করিতে ইচ্ছা করেন, যদি প্রতিজ্ঞার বল চান, তবে তিনি জগতের সাধু মহাত্মাদিগের জীবনচরিত মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করুন।

প্রতিজ্ঞার বলবৃদ্ধির তৃতীয় উপায়টী ঈশ্বরের উপাসক মাত্রেরই বিদিত। তাহা কেবল আন্তরিক সরল প্রার্থনা। মানাত্মাতে বল ও আশা দিবার এমন দ্বিতীয় উপায় নাই। যাহারা কখনও একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহারা চিরদিন এক বাক্যে এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছেন। প্রার্থনা দ্বারা মানব অন্তরে কি সুমহৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, কি আশ্চর্য্য বল ও তেজ অবতীর্ণ হয়, কি অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় সামান্য প্রলোভনের বাতাসে কম্পিত হইতেছিল, প্রার্থনার গুণে তাহার অন্তরে যেন বজ্রের বল উপস্থিত হইল। ধর্ম্ম জগতে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই বলি প্রার্থনাই আত্মার অন্ন, পান, প্রার্থনাই ধর্ম্ম জীবনের প্রধান সম্বল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি অধিক কথা জানি না এবং শিখি নাই। একটী সত্য শিখিয়াছি এবং সেই সত্যটীই প্রাণপণে ধরিয়া আছি। সে সত্যটী এই, যে বলের দ্বারা মানুষ পাপ তাপ হইতে রক্ষা পায়, সে বল ঈশ্বরের বল। প্রার্থনাই মনুষ্যকে সেই বল দিয়া থাকে।

সক্রেটিসের মৃত্যু।

প্লেটো সক্রেটিসের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন এবং এথিনীয়াগণ যখন হেমলক বিষ পান করাইয়া মহাত্মা সক্রেটীসকে হত্যা করেন, তখন প্লেটো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

এই সকল লিবার পর তিনি উঠিয়া হস্ত পদ ধৌত করিবার জন্য একটী ঘরে গেলেন। ক্রাইটন তাঁহার অনুসরণ করিলেন কিন্তু তিনি আমাদিগকে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। সুতরাং আমরাও অপেক্ষা করিয়া রহিলাম এবং তিনি যে সকল কথা বলিয়া গেলেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমরা বাস্তবিক অনুভব করিতে লাগিলাম যে পিতৃবিয়োগে সন্তানদিগের ন্যায় আমাদিগকেও এ জীবনের অবশিষ্ট কাল পিতৃহীন হইয়া কাটাইতে হইবে। হস্ত পদ ধৌত হইলে তাহার পুত্রদিগকে তাঁহার নিকট আনা হইল, (তাহার দুইটী অল্প বয়স্ক পুত্র ও একটী অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক পুত্র ছিল) এবং সেই সঙ্গে তাহার পরিবারস্থ মহিলাগণ ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি যখন তাহাদের সহিত কথা বলেন তখন ক্রাইটনকে ও মহিলাগণকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদানান্তর যাইতে বলিলেন, এবং নিজে আমাদের নিকটে আসিলেন। তখন সূর্য্য অস্তগত প্রায়। কারণ তাহার আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল কিন্তু তিনি স্নান করিয়া

আসার পর আর অধিক কথা কহিবার অবসর পাইলেন না। কারণ একাদশ কারাধ্যক্ষের ভৃত্য তখনি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "সক্রেটিস অপরাপর ব্যক্তিতে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা তোমাতে দেখিতেছি না; ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিয়োগে আমি যখন তাহাদিগকে বিষপান করিবার কথা জানাইয়াছি, তখন তাহারা প্রায় সকলেই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে ও আমাকে গালাগালি দিয়াছে। কিন্তু অপর পক্ষে এখানে অদ্যাবধি যতলোক আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে আমি তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উদার, বিনম্র ও সদ্‌গুণশালী দেখিতেছি; সেই জন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি আমার প্রতি কুপিত হইতছ না। বরং যাহারা তোমাকে এই দশাপ্রাপ্ত করিয়াছে তাহাদের প্রতি কুপিত হইতেছ। তুমি বিলক্ষণ জান তাহারা কে। তবে এক্ষণে বিদায়, তুমি বুঝিতেই পারিতেছ আমি কি জন্য আসিয়াছিলাম; যথাসাধ্য প্রশান্ত ভাবে এই অপরিহার্য্য কার্য্য সম্পাদন কর।" এই কথা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি কাঁদিয়া ফেলিল, এবং আমাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু সক্রেটিস তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমাকেও বিদায়, তোমার পরামর্শ মত কার্য্য করিব।" অনন্তর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়া বলিলেন, ঐ লোকটির ব্যবহার কি সৌজন্যপূর্ণ। আমার এখানে আসা অবধি ও ব্যক্তি অনেকবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে ও অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়াছে, এবং সর্ব্বাংশে নিজের সাধুতার পরিচয় দিয়াছে। এখন দেখ ও কেমন সদাশয়, আমার জন্য কিরূপ কাঁদিতেছে। ক্রাইটন এক্ষণে উহার আদেশ অনুসারে কাজ করা উচিত; বিষ যদি প্রস্তুত হইয়া থাকে কাহাকেও আনিতে বল। যদি এখনও প্রস্তুত না থাকে তবে যাহার উপর উহা প্রস্তুত করিবার ভার আছে তাহাকে উহা শীঘ্র প্রস্তুত করিতে বল। ক্রাইটন বলিলেন,

সক্রেটিস, এখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই, গিরিশৃঙ্গের উপরে এখনও দেখা যাইতেছে। আমি অনেক লোকের কথা শুনিয়াছি তাহাদিগকে বিষপান করিবার আদেশ করিবার পরেও তাহারা অনেকক্ষণ বিলম্ব করিয়াছে ও সেই সময়ের মধ্যে উত্তমরূপে পানভোজন করিয়াছে। অতএব তাড়াতাড়ি করিও না, এখনও যথেষ্ট সময় আছে। সক্রেটিস উত্তর করিলেন ;— ক্রাইটন সে সকল লোকের পক্ষে সেইরূপ করাই ঠিক কারণ তাহারা মনে করে ঐ প্রকার করাতে তাহাদের কিছু লাভ আছে ; কিন্তু আমার পক্ষে ও প্রকার না করাই উচিত, কারণ আমি বিলম্ব করিয়া পান ভোজন করাতে কোন লাভ দেখি না। পরন্তু আপনার চক্ষে আপনি উপহাস্পদ হইব, কারণ তাহাতে এই দেখাইবে যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই এবং এ জীবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা নাই। যখন ইহা জানি যে এ জীবন তো এক প্রকার গেছেই। অতএব যাও আমার কথা শুন, এবং আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য কর ; এই কথা শুনিয়া ক্রাইটন তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান বালককে ইঙ্গিত করিলেন। সে চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে যে বিষ খাওয়াইবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আসিল। সে ব্যক্তি একটা বাটিতে করিয়া গুঁড়া বিষ লইয়া আসিল। সক্রেটিস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি তো সব জান, কি করিতে হইবে বল দেখি ?" সে ব্যক্তি বলিল এমন বেশী কিছু করিতে হবে না। আপনি এটা পান করার পর বেড়াইতে থাকিবেন যতক্ষণ না পা ভারী হয় ; দুটা পা ভারী হইলেই শয়ন করিবেন, আর কিছুই করিতে হইবে না।" এই বলিয়া সে বিষের বাটিটা সক্রেটিসের হাতে দিল।

কি বলিব, সক্রেটিস আনন্দিত অন্তরে তাহার হাত হইতে বিষের পাত্রটা লইলেন। তাহার আকৃতিতে কোন উদ্বেগ বা পরিবর্ত্তন

লক্ষিত হইল না। তাঁহার প্রচলিত রীতি অনুসারে সেই ব্যক্তির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি বল? দেবতাদিগকে নিবেদন করিবার জন্য কি এই পাত্র হইতে কিয়দংশ দিতে পারি? সে ব্যক্তি বলিল, যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকু বিষ প্রস্তুত করি। অধিক করি না। সক্রেটিস বলিলেন—" তোমার কথা বুঝিলাম না, কিন্তু দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করা ও তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা কর্ত্তব্য, যেন ইহকাল হইতে অবসৃত হইয়া আমার আত্মার কল্যাণ হয়। এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষণকাল স্থিরভাবে থাকিলেন, তৎপরে প্রসন্নচিত্তে বিষের পাত্র মুখে তুলিয়া দিলেন। আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলাম কিন্তু যখন তাহাকে বিষের পাত্র মুখে তুলিতে দেখিলাম ও বিষপান করিয়া ফেলিলেন জানিলাম, তখন আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার কথা এই বলিতে পারি আমি অনেক চেষ্টা করিরাও অশ্রু সামলাইয়া রাখিতে পারিলাম না। দুই এক বিন্দু নহে, জল স্রোতের ন্যায় আমার অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি আমার গাত্রবস্ত্রে নিজের মুখ আচ্ছাদন করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। তাহার দুর্ভাগ্যের কথা মনে হইল না কিন্তু সঙ্গী ও গুরু হারাইলাম বলিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথাই মনে হইতে লাগিল। ক্রাইটনও চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিতেছিলেন না তাহাকে বাধ্য হইয়া আমার অগ্রেই উঠিতে হইল। এপোনোতোর পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিতেছিলেন, এক্ষণে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া সক্রেটিস ব্যতীত উপস্থিত সকলেই কাঁদিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সক্রেটিস বলিয়া উঠিলেন, বাঃ তোমরা তো বেশ লোক!

তোমরা করেছ কি? বলিতে কি পাছে এই প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় এই ভয়ে আমি স্ত্রীলোকদিগকে থাকিতে দিই নাই। কারণ আমি শুনিয়াছি মৃত্যুকালে ক্রন্দনের শব্দটা অমঙ্গল। অতএব স্থির হও। ধৈর্য্য ধারণ কর। আমারা যখন এই কথা শুনিলাম তখন লজ্জিত হইয়া অশ্রু নিবারণ করিলাম। তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে যখন দেখিলেন, যে পদদ্বয় ভারী হইতেছে তখন চিৎ হইয়া শয়ন করিলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিষ দিয়াছিল সে মধ্যে মধ্যে তাহার পদদ্বয় পরীক্ষা করিতে লাগিল। তৎপরে তাহার একখানা পায়ের পাতাতে জোরে চাপ দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তিনি তাহা জানিতে পারিলেন কিনা? সক্রেটিস উত্তর করিলেন, যে তিনি জানিতে পারেন নাই। তৎপরে সে ব্যক্তি তাহার উরুদ্বয় চাপিল ও ক্রমে উপরে যাইতে লাগিল। আমাদিগকে দেখাইল, কেমন তাহার শরীর শীতল ও স্পন্দহীন হইতেছে। সক্রেটিস ও নিজ শরীরের স্থানে স্থানে স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যখন বিষ তাহার শ্বাসদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিবে তখন তাহার প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিবে। ক্রমে তাহার শরীরের নিম্নার্দ্ধ সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল; তখন তিনি একবার মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, ক্রাইটন ইস্কুলেপিয়াসের একটা মোরগের দাম দেওয়া হয় নাই। সেই দামটা দিতে ভুলিও না।

এই তাঁহার শেষ কথা। ক্রাইটন বলিলেন 'ভুলিব না।' মনে করিয়া দেখুন আপনার আর কোন আদেশ আছে কিনা। তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে একবার নড়িলেন। তখন সেই ব্যক্তি তাহার শরীরের আবরণ খুলিয়া দিল।

তদন্তর সক্রেটিস ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া ক্রাইটন তাহার চক্ষু ও মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপেই আমাদের গুরুবর ও উপদেষ্টার জীবন অবসান হইল;

আমার জীবদ্দশায় যত মানুষ দেখিয়াছি তন্মধ্যে তিনি গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মানব-জীবন

বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে পশু পক্ষিদিগেরও মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান, বিচার-শক্তি, প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা যে কেবল মাত্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতিরই অধীন তাহা নহে; তাহাদের মধ্যেও জ্ঞান এবং বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসর কাল পণ্ডিতগণ ইহাদের আচরণ ও কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ইহাদের জ্ঞানও বিচার শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে; দয়া, পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সব উন্নত ভাব মানব-জীবনে ধর্ম্মভাব নামে অভিহিত, তাহাও তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

তাহাই যদি হইল, তবে মানুষ্যতে আর পশুপক্ষীতে প্রভেদ কি? মানবের বিশেষত্ব তিনটি বিষয়ে রহিয়াছে:—

প্রথম আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা; আমরা দেখিতে পাই যে ঈশ্বর মনুষ্য মাত্রকেই এই আশ্চর্য্য স্বভাব দিয়াছেন, যে মানব মন চারিদিকে নানাবিধ ভোগ-সুখের সামগ্রী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তাহাতে তৃপ্ত নহে; সর্ব্বদাই কি এক অদৃশ্য বিষয়ের জন্য লালায়িত! মানব যে দৃশ্যজগতে বাস করিতেছে তাহা ভুলিয়া গিয়া মনোময় রাজ্য গড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করে এবং তাহার মধ্যেই নিজ সুখ দুঃখ স্থাপন করে। অদৃশ্য ও আধ্যাত্মিক সত্য সকলের চিন্তাতে এত ব্যাপৃত হইতে পারে যে দৈহিক সুখকে সুখ জ্ঞান করে না, বিপদকে বিপদ জ্ঞান করে না। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কেবল আত্মার ভাবময় সৃষ্টি মাত্র, তাহাতেও

মানব এতদূর আসক্ত হইতে পারে যে কোনও জীব অপর জীবের প্রতি এত আসক্ত হইতে পারে না। এই আধ্যাত্মিকতা মানব-প্রকৃতির এক গূঢ় রহস্য।

মহাত্মা যীশুর প্রচারিত স্বর্গ রাজ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্বর্গ রাজ্যের প্রকৃতি যে কি তাহা ধারণা করা কঠিন। এই মাত্র বুঝা যায় যে ইহা মানব-সমাজের একটি আকাঙ্ক্ষিত উন্নত অবস্থা মাত্র যাহাতে মানব ঈশ্বরের অধীন হইবে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রতি যীশুর মনের কি প্রগাঢ় অভিনিবেশ! এই স্বর্গ রাজ্য পৃথিবীতে আনিবার জন্যই তিনি লালায়িত ছিলেন। আহারে বিহারে নিয়তই এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিত; এবং ইহার জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন।

বুদ্ধের নির্ব্বাণ ধর্ম্ম কি? তাহা তিনিই জানিতেন। কিন্তু দেখিতে পাই যে ইহার জন্যই তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র হইয়া ভীক্ষু হইয়াছিলেন। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলেন—উঠিতে বসিতে নিদ্রাতে জাগরণে সর্ব্বদাই ঐ বিষয়। ইহা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না যে মানব ইতিবৃত্তে যে সকল মহাজনের জীবনচরিত আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা সকলেই এইরূপ কোন না প্রবল আকাঙ্ক্ষার গুণেই মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে হৃদয়ে কোনও মহৎ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহা জীবনের উচ্চ ভূমিতে উঠিতে পারে না; অনিবার্য্যরূপেই ধূলাতে লুটায়। যে পরিমাণে হৃদয়ে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ আদর্শ কাজ করে, সেই পরিমাণে মানবের মনুষ্যত্ব হয়।

আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত যে কেবল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের জীবনেই দেখা যায় তাহা নহে, রাজনৈতিক, সকল বিভাগেই এরূপ উন্নত আদর্শগ্রস্ত লোক দৃষ্ট হইতেছে। জোসেফ ম্যাটসিনির কথা

অনেকেই অবগত আছেন। পরাধীন ইটালী কিরূপে স্বাধীন হইতে পারে এই চিন্তা তাঁহার মনে এমনি প্রবল হইয়াছিল যে, তাহার জন্যই তিনি দেহ মন সমর্পণ করিলেন। হাতের নিকটে সুখের সকল উপায় থাকিতে সে সকলে অবহেলা করিয়া স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, দেশে দেশে দরিদ্রের বেশে ভ্রমণ করিয়া জীবন শেষ করিলেন। কিছুতেই তাঁহার হৃদয় হইতে সে ভাব গেল না। এখনও এমন কত লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের মনে এইরূপ এক একটা নেশা লাগিয়া তাঁহাদিগকে তাহাতে নিমগ্ন রাখিয়াছে। সেই সত্যেই তাঁহারা বাস করিতেছেন, তাহাতেই জীবন ধারণ করিতেছেন। কে কোন ইতরপ্রাণীতে এইরূপ ভাব দেখিয়াছেন? দৃশ্য জগতকে ভুলিয়া কবে তাহারা অদৃশ্য জগতের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে? দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বজাতির কল্যাণের জন্য, সামাজিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য কত লোকই প্রাণ দিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অহরহ দেখিতে পাই, কিন্তু কে কবে ইতরপ্রাণীকে এইরূপ স্বজাতির জন্য, জীবন উৎসর্গ করিতে দেখিয়াছেন? তাহারা সম্মুখে যে জিনিস দেখিতে পায় তাহাই ভালবাসে; আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা যে কি তাহা তাহারা কিছুই জানে না; সত্যকে যে প্রীতি করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। মানুষ এই সমস্ত বিষয় জানে এবং এইখানেই তাহার বিশেষত্ব এবং ইতর প্রাণীর সহিত পার্থক্য।

মানব সমাজের বর্ব্বরাবস্থাতে মানব-জীবন পশুজীবনের অধিক নিকটে থাকে, সুতরাং সে অবস্থাতে জীবনের অধিক উচ্চলক্ষ্য বা আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তখন মানব আহার নিদ্রা ভয়াদির অধীন হইয়া জীবন যাপন করে; এবং অধিক পরিমাণে দৃশ্য জগতেই বাস করে। কিন্তু যতই মানব সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ততই বর্ব্বর অবস্থা হইতে উন্নত হইতে থাকে।

এক্ষণে যে সকল জাতি সভ্যতাতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অধ্যাত্ম-বিষয় গ্রহণের শক্তির গুণেই উন্নত হইয়াছেন। সেই সকল জাতির মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তির এই আধ্যাত্ম-পরায়ণতা থাকাতেই তাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। সে সকল দেশে অতি সামান্যাবস্থার লোকদিগের ও এ জ্ঞান আছে যে কেবল অর্থোপার্জ্জন ও পানাহার নিদ্রাদির দ্বারা মানবজীবনের মহত্ত্ব হয় না; ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু চাই। মহাত্মা খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, মানব কেবলমাত্র অন্ন পান দ্বারা জীবন ধারণ করে না; কিন্তু ঈশ্বরের মুখবিনিসৃত প্রত্যেক বাণীর দ্বারা জীবিত থাকে। সত্য ঈশ্বরের মুখ বিনিসৃত বাণী। সত্যই দেবভোগ্য অমৃত। সত্যের দ্বারা যিনি জীবন ধারণ করেন তিনিই জীবিত। মানব জীবনের মহত্ত্ব সাধন বিষয়ে এই একটি প্রধান স্মরণীয় বিষয়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই দেখি, মানব প্রকৃতিতে অনুতাপের গভীরতা এবং আত্ম-প্রসাদের উচ্চতা আছে। কোন ইতরপ্রাণীতে এই দুইয়ের একটি দেখিতে পাওয়া যায় না। কুকুর কোনও দোষ করিলে তাহার প্রভু বাড়ী আসিয়া তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারেন, এরূপ ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অনুতাপের পরিচায়ক নহে, কেবল মাত্র সাজা পাইবার ভয়েই তাহাদের মুখের ঐরূপ ভাব হইয়া থাকে। প্রকৃত অনুতাপ ইতরপ্রাণীতে নাই। ভূতকালে কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছে বলিয়া তাহারা কি কখনও যাতনা পাইয়া থাকে?

এক সময়ে একজন ইউরোপীয় ভদ্র লোক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেটী এই যে তিনি ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে নিজ শ্বশুরের নিকটে বিদায় লইতে গেলেন। তাঁহার শ্বশুর যৌবনকালে ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন না; ঘোর বিষয়ী এবং ধর্ম্মে উদাসীন ছিলেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন।

বিদায় প্রার্থনা করিতে গিয়া, জামাতা ঘরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কাঁদিতেছিলেন। তিনি শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাকে এতটা উত্তেজিত দেখিতেছি তাহার কারণ কি? আপনি কাঁদিতেছিলেন কি?" উত্তরে তাঁহার শ্বশুর বলিলেন,—"অনেক বৎসর গত হইল যখন আমাদিগের বিষয় সম্পত্তির ভাগ হয় তখন একখানি কুড়ালি, যাহা আমি অতিশয় ভালবাসিতাম, পাছে আমার ভাগে না পড়িয়া ভ্রাতার ভাগে পড়ে, এই ভয়ে আমি তাহা অগ্রেই লুকাইয়াছিলাম। এখন সেই কথা মনে হইয়া আমার যারপর নাই যাতনা হইতেছে, কেন আমার ভাইকে আমি প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম? ভাই এখন আর ইহজগতে নাই, আমি ত আর তার ক্ষতি পূরণ করিতে পারিব না। এই অনুতাপে আমি কাঁদিতেছি।" চল্লিশ বৎসর পরে একটী পাপ স্মরণ করিয়া এরূপ অশ্রুপাত করা কি কোনও ইতরপ্রাণীর পক্ষে সম্ভব, ইহা মানবেরই উচ্চ অধিকার।

এইরূপ আত্ম-প্রসাদের উচ্চতাও কেবল মানবে সম্ভব। কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেরূপ আনন্দ ইতর প্রাণীতে সম্ভবে না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি;—ডেনমার্ক দেশে যখন ভয়ানক শীত পড়ে, তখন সমুদ্রের জল জমিয়া তুহিন-শিলাময় হইয়া যায়। তখন সহরের লোক সেই তুহিন-রাশির উপরে শ্লেজনামক গাড়ী লইয়া ক্রীড়া করিতে যায়। কিন্তু সে দেশে মধ্যে মধ্যে এক প্রকার

মেঘের উদয় হইয়া বৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ ঝড় বৃষ্টির একটা প্রকৃতি এই, যে সেই বিশেষ মেঘের উদয় হইবামাত্র হঠাৎ বরফ রাশি গলিতে আরম্ভ হয়; এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। একবার একদিন সহরের লোক তুহিন-রাশির উপরে খেলিতে গিয়াছে, এমন সময়ে আকাশে হঠাৎ সেই সাংঘাতিক মেঘের উদয় হইল। একটী বৃদ্ধা দরিদ্রা সহায়হীনা স্ত্রীলোক অনতিদূরে সাগরকূলে একটী পর্ণকুটীরে বাস করিত। সে হঠাৎ আকাশে সেই ভয়ঙ্কর মেঘ দেখিয়া ভীত হইল। ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ মেঘ আর দেখা যায় নাই। কে এই বিপদ হইতে আমোদে মত্ত সহরবাসীকে উদ্ধার করিবে ভাবিয়া বৃদ্ধা আকুল হইয়া উঠিল। সে নিজে পীড়িতা ও চলিতে অসমর্থ। অনেক চিন্তার পর একটী উপায় উদ্ভাবন করিল:—অতিকষ্টে ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরেই আগুন লাগাইয়া দিল। আগুন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন সকলেই ভাবিতে লাগিল যে "তাই ত কি হবে, এ যে দেখি বৃদ্ধার ঘরেই আগুন।" সকলেই সেই বৃদ্ধাকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া সকলেই ক্রীড়া ফেলিয়া বৃদ্ধার গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল। আসিয়া দেখিল বৃদ্ধা অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। অনেক চেষ্টার পরে জ্ঞান হইলে বৃদ্ধা প্রথম প্রশ্ন এই করিল,—"সকলেই কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছে ত?" যখন শুনিল সকলেই নিরাপদ তখন তাঁহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব সন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। "ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ" বলিয়া বৃদ্ধা আবার নয়ন মুদ্রিত করিল। সেই নয়ন

মুদ্রিত করাই শেষ নয়ন মুদ্রিত করা। বৃদ্ধার জীবনের শেষ মহূর্ত্তের সেই সন্তোষের বিষয়ে একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কোনও ইতরপ্রাণীতে কি এরূপ আত্ম-প্রসাদ সম্ভব ?

তৃতীয়তঃ মানবে যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের নিদর্শন প্রাপ্ত হই তাহা ইতর প্রাণীতে কখনই দেখা যায় না।

একবার সমুদ্রের মধ্যে একখানি জাহাজে হঠাৎ আগুন লাগিয়াছিল। জাহাজের তলে কোথায় যে আগুন লাগিল, কোথা হইতে যে ধূম আসিতে লাগিল, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। সকলেই নিশ্চয় বিশ্বাস করিল যে জাহাজ অচিরে জ্বলিয়া যাইবে। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে অতিশয় দ্রুত-বেগে চালাইলে জাহাজ বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে তীরে পৌঁছিতে পারে। সুতরাং তীরের দিকে জাহাজ চালান হইল। এঞ্জিন-চালক বীরের ন্যায় তাহার স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া আগুনের অসহ্য উত্তাপসত্ত্বেও কল চালাইতে লাগিল। কাপ্তেন ক্রমাগত ডাকিয়া তাহার সংবাদ লইতেছেন। কাপ্তেন উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কেমন আছ ?" উত্তর আসিতেছে—all right, অর্থাৎ এখনও ভাল আছি। কিন্তু ক্রমে তাহার কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল. ক্রমে কাপ্তেনের প্রশ্নের উত্তরে কেবল গোঁ গোঁ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে আর কোন শব্দও শুনা যায় না। কিন্তু তখনও তাহার হস্ত তাহার কার্য্যে নিযুক্ত। ক্রমে যখন জাহাজ তীরে আসিয়া লাগিল, তখন তাহাকে বাহির করিয়া দেখা গেল, যে সে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে ; ধূমে শ্বাস বন্ধ হইয়া

গিয়াছে; অগ্নিতে পদদ্বয় অর্দ্ধসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর কয়েক মিনিট বিলম্ব হইলেই তাহার জীবন বিনষ্ট হইত। কোনও ইতর প্রাণীতে এরূপ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা কি কেহ কখনও দেখিয়াছেন?

তৎপরে আর একটী প্রধান বিষয়ে ইতর প্রাণী হইতে মানবের পার্থক্য দেখিতে পাই; তাহা অনন্তের ধ্যান ও আরাধনা। প্রত্যেক পরিমিত সত্তা এক অনন্ত সত্তার ক্রোড়ে শায়িত এবং প্রত্যেক পরিমিত শক্তি এক মহাশক্তি হইতে উদ্ভূত, ইহা মানব ভিন্ন ইতর প্রাণী কখনও অনুভব করিতে পারে না। সুসভ্য ও অসভ্য সকল অবস্থাতে মানবের এই এক প্রধান লক্ষণ যে মানুষ উপাসনা-শীল জীব। মানব যেমন উদরান্নের জন্য কৃষি বাণিজ্যের বিস্তার করিয়াছে, মস্তক রাখিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, জ্ঞানালোচনার জন্য শিল্প সাহিত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি আরাধনার জন্য দেবমন্দির, উপাসনালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে। অপরাপর প্রাণীর ন্যায় দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকলে যে মানবের অভিনিবেশ তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই, তাহা সকল প্রাণীর পক্ষেই স্বাভাবিক কিন্তু এই অদৃশ্য পদার্থের প্রতি অভিনিবেশ, এই অতীন্দ্রিয় শক্তির আরাধনা ইহা মানব প্রকৃতির এক গূঢ় রহস্য। মানবের ভাষা বোঝে না এবং মানবের অনুরূপ ভাব যাহার নয়, এমন কোনও জীব যদি মানবের আরাধনা ব্যাপার দর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না।